দেশপ্রিয়

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

দেশপ্রিয়
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

শচীন দত্ত

অনুবাদ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়
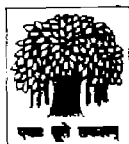
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

প্রাক্‌কথন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা আর দেশপ্রিয়র জন্ম একই বছরে। তাঁর বিচক্ষণতা, স্বার্থত্যাগ আর প্রতিভার প্রভাবে সমসাময়িক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গের তিনি ছিলেন অন্যতম। ভারতীয় জাতীয়তার দ্রুত জাগরণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিবাদের তিক্ত আবহাওয়ায় তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশ (1885-1910)।

দেশপ্রিয়র জীবনে বিলাতি শিক্ষা হয়েছিল ফলপ্রসূ। কেমব্রিজের ডাউনিং কলেজ থেকে ট্রাইপস্ পাওয়ার পর 'গ্রে'স ইন' থেকে ব্যারিস্টার হয়ে 1909 সালে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। কেমব্রিজে থাকাকালীন তিনি বিচক্ষণ বক্তা হিসেবে নাম কেনেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান মজলিস আর পরে ইস্ট ওয়েস্ট সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ওদিকে খেলাধূলায় তিনটি বৈশিষ্ট্যসূচক সম্মানেরও তিনি গৌরব অর্জন করেন। যতীন্দ্রমোহন এই কেমব্রিজেই তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী নেলী গ্রে-র সাক্ষাৎ পান এবং 1910 সালে তাঁর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ পরবর্তী জীবনে, ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি স্বামীর সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। ইংরেজ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় সংগ্রামে আত্মভূত হয়ে, স্বকীয় দাবীতে প্রথম শ্রেণীর নেত্রী হিসেবে সম্মানিত হন।

ভারত প্রত্যাগমনের পর 1910 সালে যতীন্দ্রমোহন হাইকোর্টে যোগ দেন এবং রিপন ল কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত লাভজনক পসার বিস্তার করেন।

1911 সালে কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম সারির স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম হিসেবে কারাবরণ করেন। যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর সহকর্মীরা সারা দেশকে যে অনন্য ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন তার ভূয়সী প্রশংসা করে গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় চট্টগ্রামকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে দুটি রচনা প্রকাশিত করেন —

'চিটাগং টু দি ফোর' (সম্মুখ সমরে চট্টগ্রাম) এবং 'চিটাগং স্পিক্‌স' (চট্টগ্রামের বাণী)। 1923-24 সালে চিত্তরঞ্জন দাস এবং মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠার পর যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হয়ে পার্টির কার্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। 1922 সালে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়ে 1933 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই পদে আসীন থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বরাজ্য পার্টির সহ-নেতা হন এবং প্রকৃত পক্ষে চিত্তরঞ্জনের প্রধান সহকারী গণ্য হন। 1925 সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব যতীন্দ্রমোহনের ওপর ন্যস্ত হয়। বঙ্গীয় বিধানসভায় তিনি স্বরাজ্য পার্টির প্রধান, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস পার্টির সভাপতি এবং কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। 1928 সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন এবং সেই বছরই 'নেহরু রিপোর্ট' আলোচনার জন্য যে অল পার্টি কনফারেন্স হয় তাতে তিনি প্রধান প্রতিনিধিদের অন্যতম বলে গণ্য হন। রিপোর্টের পূর্ণ সমর্থনে তাঁর যে যুক্তি এবং ভাষণে যে বক্তব্য তা সেই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে আজও অবিস্মরণীয়।

স্বদেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধায় অভিহিত 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন আজ এক কিংবদন্তীতুল্য ব্যক্তিত্ব। অদম্য মুক্তির সংগ্রামী, তাঁর মানসিক শক্তি ছিল দুর্দমনীয়। দুঃখ প্রকাশ করে একবার তিনি বলেছিলেন, "দেশপ্রেমে উৎসর্গ করার জন্য আমার কেবল একটাই প্রাণ।" সেই অনন্য প্রাণ উনি উৎসর্গ করেন 1933 সালে রাজবন্দী অবস্থায় রাঁচিতে শহীদের মৃত্যু বরণ করে।

যতীন্দ্রমোহনের মতো মুক্তি সংগ্রামী মানুষদের শহীদের মৃত্যু বেশ কিছুটা বেদনাদায়ক। মুক্তি সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর, পরবর্তী যুগের মানুষ শহীদদের ভুলে যায়। অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে; আজকের মানুষ সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন শহীদ যতীন্দ্রমোহনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা অল্পই জানে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পাঠকের জন্য শ্রীশচীন দত্তের এই গ্রন্থের গুরুত্ব অশেষ এবং অনস্বীকার্য। শচীনবাবু একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং সুপণ্ডিত। এই প্রচেষ্টায় তিনি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে যতীন্দ্রমোহনের জীবনীর প্রাসঙ্গিক যথাসম্ভব মৌলিক সূত্রের সন্ধান করেছেন। আমি নিঃসন্দেহ যে এই বইটি, ভারতে, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজনা।

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভূমিকা

কলেজের ছাত্র এবং একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে অন্য অনেকের সঙ্গে আমারও পরম সৌভাগ্য হয়েছিল চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রবাহে ছাত্র-কর্মী হিসেবে কাজ করার। এক যুগ পরে (1930 সাল থেকে) সাংবাদিকতার কাজে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা হিসেবে তাঁদের যশ এবং খ্যাতি জগৎজুড়ে ছড়িয়ে যেতে, আর সেই সময়কার সাংঘাতিক ঘটনাবলী তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশপ্রিয়র অনেকখানি কাছাকাছি আসার বিরল সুযোগও আমি পেয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের যে বিস্তৃত বিবরণ আমি প্রস্তুত করে দেশপ্রিয়কে দিয়েছিলাম তারই ভিত্তিতে ঐ কমিটির কাজ হয়েছিল।

অন্যান্য বহু সম্মানিত নামের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনও আজ জগতে বিস্মৃত। সেই দ্রুত বিলীয়মান স্থপতি এবং মূল্যবোধকে সীমিত ভাবে পুনর্নির্মাণেই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই দুরূহ কাজে প্রামাণিক তথ্যের একান্ত অভাবে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটলেও, সৌভাগ্যক্রমে দেশপ্রিয়র অধিকাংশ কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সংবাদপত্রের কাটিং এবং সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা থাকায় সুবিধাও যথেষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, আমার অগ্রজ প্রয়াত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের রেখে যাওয়া কিছু স্মৃতি সঞ্চয়ের যথেষ্ট সাহায্যও আমি পেয়েছি। আইনজীবী এবং সাংবাদিক হিসেবে সেনগুপ্ত দম্পতিকে উনি ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন। ব্যক্তিগত দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণেও গ্রন্থরচনার কাজ ব্যাহত হয়েছে।

তাহলেও সাহায্যের তালিকাও কিছু কম নয়। বহু সজ্জন এবং সংস্থা আন্তরিক

ভাবে উৎসাহ দিয়ে আর সক্রিয় ভাবে সাহায্য করে এই দুরূহ কাজে আমায় সাহস দিয়েছেন, সাহায্যও করেছেন। তাঁদের সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য, ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, যিনি শুধু ভূমিকা লিখেই নয় তাঁর বহুমূল্য ধারণা এবং অভিভাবনে আমার কাজকে সহজ করেছেন। তাঁর কাছে আমি অনন্যভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ সন্তোষকুমার বসুর কাছে যিনি যতীন্দ্রমোহনের পরেই কলকাতার মেয়র হন এবং আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সামাজিক কর্মী সঞ্জীব প্রসাদ সেনের কাছে। কলকাতায় চট্টগ্রাম পরিষদের শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ফণীভূষণ মজুমদারের কাছে। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন দেশপ্রিয়র প্রাক্তন সচিব সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত, 'মুনিসিপ্যাল গেজেটে'র প্রাক্তন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, খ্যাতনামা লেখক এবং সাংবাদিক ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলকাতা) অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. ব্যানার্জি চৌধুরী। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে প্রখ্যাত দৈনিকপত্রের কাছে, বিশেষ ভাবে 'অমৃতবাজার', 'অ্যাডভান্স' এবং 'দ্য স্টেট্সম্যান' আর বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, 'মডার্ন রিভ্যু' আর 'ক্যলকাটা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট'।

বস্তুতঃ সমসাময়িক সংবাদপত্র, অধিকাংশ মূল তথ্যের সূত্রই শুধু নয়, প্রবুদ্ধ নেতার অল্পসংখ্যক প্রবীণ সহকর্মী এবং বিমুগ্ধ অনুগামীদের মুখ থেকে শোনা এবং সংগ্রহ করা তথ্যও প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শচীন দত্ত

সূচিপত্র

এক

প্রথম জীবন

বংশ পরিচয়। জন্ম। সামাজিক পরিবেশ।

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পাটিয়া থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু বারামা গ্রামের এক সুবিখ্যাত বৈদ্য পরিবারে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর জন্ম। তাঁর পিতামহ ত্রাহীমোহন সেন ছিলেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং পিতামহী মেনকাদেবী ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাঁদের চার পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে চতুর্থ সন্তান যাত্রামোহন ছিলেন সবচেয়ে চালাক-চতুর। যাত্রামোহনের জন্ম 1845 সালে। কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় হয়ে পড়েন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং বৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করেন। স্কুলের সেরা ছাত্র হিসেবে যাত্রামোহন কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ আনন্দচরণ খাস্তগীর-এর সুনজরে পড়েন। তিনি বালকটির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তার জন্য অর্থের বন্দোবস্ত করে দেন যাতে যাত্রামোহন কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন। সসম্মানে আইন ও কলাবিভাগে স্নাতক হয়ে যাত্রামোহন চট্টগ্রামে ওকালতি শুরু করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলার ওই ছোট অথচ প্রগতিশীল শহরে প্রভূত পসার অর্জন করেন।

জন্মগত প্রতিভা, আইনে পারদর্শিতা, বিশেষ করে জেরা করা ও অকাট্য যুক্তি উত্থাপনের অদ্ভুত ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে পেশাদারী নিষ্ঠার দৌলতে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যাত্রামোহন চট্টগ্রামের আইনজীবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। একই সঙ্গে চট্টগ্রামের বাইরেও জনসেবকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন নবজাগ্রত বাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতৃবর্গের অন্যতম সুযোগ্য নেতা।

আইনজীবী ও জননেতা হিসেবে যাত্রামোহনের প্রতিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ডাঃ খাস্তগীর তাঁর চতুর্থ এবং সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। তাঁর অন্যান্য তিন জামাতা ছিলেন বিশিষ্ট আই সি এস, বি এল গুপ্ত (বিখ্যাত জেলা ও সেসন জজ), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র সেন এবং কলকাতা নিবাসী ডাঃ এন সি দাস। ডাঃ খাস্তগীরের আর এক কন্যা কুমুদিনী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট এবং কলকাতার বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা। তাঁর পাঁচ পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠ হলেন মহেন্দ্রলাল। দ্বিতীয় পুত্র অকৃতদার জনেন্দ্রলাল সহজ, সরল জীবন যাপন করতেন; তৃতীয় সত্যেন্দ্রলাল। চতুর্থ হেমেন্দ্রলাল, যিনি বঙ্গীয় সরকারি কর্মচারী হিসেবে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান, তাঁর পঞ্চম পুত্র সুরেন্দ্রলাল, যিনি এস এল খাস্তগীর নামে সুপরিচিত ব্যারিস্টার এবং চট্টগ্রামের একজন গণ্যমান্য নাগরিক।

এই সুরেন্দ্রলালের স্ত্রী তুষারবালা ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই সি এস, যিনি কর্মক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় ডিভিশন্যাল কমিশনার, পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, সুলেখক এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর সি দত্তের নাতনী। তুষারবালা নিজেও ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম মহিলা সমাজে নেতৃস্থানীয়া, একনিষ্ঠ সমাজসেবী, কলারসিক ও শিল্পী। আর সি দত্তের কনিষ্ঠতম কন্যা, বিদগ্ধ শ্রীমতী সুশীলাদেবী তাঁর শেষ জীবন এই খাস্তগীর পরিবারেই অতিবাহিত করে 1942 সালে 70 বছর বয়সে চট্টগ্রামেই মারা যান। সামাজিক ভাবে এই পরিবারটি ছিল সর্বদা সজাগ, জাতীয় কর্মচাঞ্চল্যে সদাস্পন্দিত। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান লেখক এই পরিবারের সঙ্গে বেশ সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলেন।

বিচক্ষণ এবং বিখ্যাত ডাক্তার (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) হওয়া ছাড়াও আনন্দ চরণ খাস্তগীর ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা — যেটা পরে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ এবং তারও পরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিত হয়।*

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল (প্রখ্যাত দেশভক্ত) প্রমুখ সমসাময়িক মনীষীদের অন্যতম ডাঃ খাস্তগীর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা — বাংলার নবজাগরণে যাঁদের দান চিরস্মরণীয়। তাছাড়া কলকাতায় সাধারণ ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। প্রখ্যাত ডাক্তার এবং লোকহিতৈষী কর্মী হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছাড়াও, বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে

---

*কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ যে ডাঃ আনন্দ চরণ খাস্তগীর প্রতিষ্ঠা করেন একথা প্রথমে অজানাই ছিল। বি. এম. কলেজ উদ্বোধনের সময় বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বি. এম. কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের একটি চিঠির উল্লেখ করে এই তথ্য প্রকাশ করেন এবং বলেন যে আনন্দ চরণ ছিলেন অত্যন্ত লোকহিতৈষী মানুষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাংলার তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে ওঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। নবীনচন্দ্র সেনের আত্মকথা 'আমার জীবন' থেকে জানা যায় যে বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জননেতা ডাঃ আনন্দ চরণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (1885) দশ বছর পূর্বে, 1875 সালে প্রতিষ্ঠিত, সর্বপ্রথম স্থানীয় সাধারণ সংঘ, চট্টগ্রাম এ্যাসোশিয়েশন-এর 'জনক'।

পিতৃ এবং মাতৃকুলের এই অনন্যসাধারণ ঐতিহ্য নিয়ে, তৃতীয় সন্তান এবং দ্বিতীয় পুত্র যতীন্দ্রমোহন বারামা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 22 ফেব্রুয়ারী, 1885।

স্বপ্ন-সন্তান কাহিনী — স্বপ্নে দেখা শিশু

আজ থেকে 110 বছর পূর্বে, গত শতাব্দীর আশির দশকে এই শিশুর জন্ম। মা ছিলেন করুণাময়ী, ধর্মপ্রাণা। কথিত আছে গর্ভাবস্থায় তিনি বহুবার স্বপ্ন দেখেছিলেন নীলাক্ষ এক শিশু, সমুদ্রে প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের ওপর খেলা করছে। বস্তুতঃ, জন্ম থেকেই শিশুটি ছিল সুদীপ্ত স্বাস্থ্যবান, বর্ধিষ্ণু সংসারে সকলেরই আনন্দস্থল এবং প্রতিবেশীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। বড় হলেন বৃহত্তর জীবনের প্রভূত ইশারা দিয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শ গড়ে উঠল অটল মানসিক শক্তি দিয়ে জয়ী হওয়ার অসীম বিশ্বাসে।সেই শিশু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এমন সময় এবং স্থানে তাঁর জন্ম যে দুটোই ঐতিহাসিক এবং অবিস্মরণীয়।

জন্ম সাল — 1885

আঠার'শ পঁচাশী সাল — অবিস্মরণীয় বছর। একদিকে জাতীয় পুনরুত্থান ও আত্মিক ভাবে ভারতের নবজাগরণ — অন্য দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। নবজাগরিত নাগরিকদের রাজনৈতিক আগ্রহে, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত প্রতিবাদ জানানোর একটি মূলকেন্দ্রের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃহত্তম রাজনৈতিক কেন্দ্র, — কংগ্রেসের নীতি এবং ধারা পরিবর্তিত হয়। নেতৃত্বের গুরুভার নেমে আসে সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে রাজনৈতিকতায় প্রগাঢ় ভাবে উদ্ভাসিত এবং জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষের হাতে। আন্দাজ দুই দশকের মধ্যে, জাতীয়তার প্রথম পতাকা ওড়ে 1905-11 সালে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনে। নব জাগরণের প্রচণ্ড উন্মাদনায় প্রকৃতপক্ষে সারা দেশ জেগে ওঠে আর বিদেশী শাসক চালিয়ে যায় নৃশংস নির্যাতন, যার নিকৃষ্টতম উদাহরণ হল জালিয়াঁওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ফলে, জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন প্রবল হয় এবং 1919 সালে মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে

সঙ্গে কংগ্রেস হয়ে ওঠে ভারতীয় জাতীয়তার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বহু বৎসরব্যাপী বহু বিপর্যয়ের পর সেই আন্দোলনেরই শেষ পরিণতি হল 15 ই আগস্ট 1947, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

নবযুগ সৃষ্টিকারী সময়ের পরম গুরুত্বপূর্ণ বছরে, বিশিষ্ট পিতা যাত্রামোহনের সংসারে এবং জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগ, চট্টগ্রাম শহরে, যতীন্দ্রমোহনের জন্ম সৌভাগ্যের সূচনাই শুধু নয়, বলা যায় দেবতার আশীর্বাদ।

প্রকৃতি-মায়ের কোলে জাত ও প্রতিপালিত, সরল জীবনমাধুর্যে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত যতীন্দ্রমোহন বড় হলেন মুক্তি পরিবেশে। বলতে গেলে একেবারে শৈশব থেকে এই প্রেক্ষাপটই গড়ে দিয়েছিল তাঁর জীবন ও কর্মের আদলটি।

পরিবার

যাত্রামোহন এবং বিনোদিনীর ছিল তেরোটি সন্তান। সর্বকনিষ্ঠ মনোমোহন বিবাহের অল্পদিন পরই মারা যান। তাঁর বিধবা পত্নী কুসুম, ডাক নাম কুমারী, সামাজিক ভাবে সরাজীবন অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় পুত্র নীরেন্দ্রমোহন এম ডি পাশ করার পর লণ্ডনে এম আর সি পি করে সেইখানেই মারা যান। তাঁর ইংরেজ পত্নী ইভা-ও অল্পবয়সেই মারা যান। তাঁদের একমাত্র কন্যা ইলিনকে যতীন্দ্রমোহন ভারতে নিয়ে আসেন এবং তাঁর ইংরেজ পত্নী নেলী মেয়েটিকে আপন সন্তানের মতোই পালন করেন। ইলিন পেটিট বর্তমানে সপরিবারে সুইজারল্যাণ্ডে আছেন।

যাত্রামোহনের কনিষ্ঠতম পুত্র রণেন্দ্রমোহন। কেমব্রিজ থেকে বি এ পাশ করে ফিরে আসার পর তিনি বড় ভাই যতীন্দ্রমোহনের পাশে দাঁড়িয়ে দেশপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি 'অ্যাডভান্স' দৈনিক পত্রের দায়িত্ব নেন। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং বার্নপুরে মার্টিন অ্যাণ্ড বার্ন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী পদ্মিনী সেনগুপ্তা স্বনামধন্যা লেখিকা। সুব্রতা চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদের বি এ পাশ করা বোন। তিনিও অল্পবয়সেই মারা যান। যাত্রামোহনের অন্যান্য ছেলেরা কেউ চট্টগ্রামে ছিলেন, কেউ ছিলেন আদি গ্রাম বারামায়, কিন্তু তাঁদের প্রায় সকলেই মারা যান অত্যন্ত অল্প বয়সে।

নেলী এবং যতীন্দ্রমোহনের তিন পুত্র। সবার বড় শিশির (জন্ম মে, 1910) কলকাতার এক বড় সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন কিন্তু অন্য দুজন, অমর এবং অনিল অল্প বয়সেই মারা যান। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার রাজবন্দী অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুর পর শিশির তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মাকেও হারান 23 অক্টোবর, 1973। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 87 এবং তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়েছিল

সারাদেশ। শিশির সেনগুপ্ত মারা যান 4 সেপ্টেম্বর, 1977। রেখে যান তাঁর স্ত্রী আইভি এবং কন্যা আয়েসাকে।

শিক্ষা

সুশ্রী বালক যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সচেতন, সুবোধ, সুদীপ্ত। বুদ্ধিতে সুতীক্ষ্ণ, বর্ণমালা শিক্ষায় তিনি ছিলেন সুচতুর। স্বাস্থ্যে বলিষ্ঠ ছিলেন বলে সমবয়স্ক বালকদের মধ্যে গ্রামীণ খেলাধুলায় ছিলেন সবার আগে। তাঁর শিক্ষার আরম্ভ প্রথমে বাড়িতে, গৃহশিক্ষকের কাছে এবং পরে 9 বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে। বছর দুয়েক পর তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে দু'বছর অধ্যয়ন করার পর (1894-96) পিতা যাত্রামোহন চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ায়, এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে যাত্রামোহন ছেলেকে নিয়ে যান কলকাতায় এবং ভর্তি করে দেন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে। পরে অবশ্য এনট্রান্স পরীক্ষা দেন হেয়ার স্কুল থেকে।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনে উচ্চাশার উন্মেষ ঘটে এই সময়েই। স্কুল শিক্ষা শেষ করে তিনি যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের বহু উজ্জ্বল রত্ন, যেমন, বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পরে যিনি রাষ্ট্রপতি হন; দেবীপ্রসাদ খৈতান, মণিমোহন সেন, জি. সি. সেন, জে এন মজুমদার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকেই, যাঁরা প্রায় সকলেই পরে আপন আপন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হন।

এই বিশিষ্ট কলেজে পড়ার সময় তাঁর সৌভাগ্য হয় প্রবীণ অধ্যাপক এম এম পারসিভ্যালের সংশ্রবে আসার —— যাঁর বহু ছাত্র পরবর্তীকালে ভারতের জনজীবনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি গৌরবান্বিত, কারণ লণ্ডনে 1931 সালে পারসিভ্যাল সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর যে-সব কাগজপত্র আমার হাতে আসে তা থেকে এই সাধু-প্রকৃতি শিক্ষকের বহু গণ্যমান্য ছাত্রের (1885-1911) সংক্ষিপ্ত হলেও প্রাণবন্ত পরিচয় পাওয়ার পরম সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁদের সকলের মধ্যে নিঃসন্দেহে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সবার শীর্ষে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যাত্রামোহনের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে, অধ্যাপক পারসিভ্যাল কেবলমাত্র কলেজে পড়াকালীনই নয়, পরে 1921 সালে যতীন্দ্রমোহন যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বড় নেতা হয়ে ওঠেন তখনও তিনি তাঁর ওপর স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন।

তবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যতীন্দ্রমোহনের অধ্যয়ন-কাল ছিল নিতান্তই স্বল্প, কারণ তাঁর পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন অন্ততঃ একটি সন্তান ব্যারিস্টার হয়। সর্ববিষয়ে যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা দেখে তাঁর স্বতঃই মনে হয়েছিল যে তাঁর ঐ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করার পক্ষে এই সন্তানই উপযুক্ত। তাছাড়া, বন্ধু-বান্ধব এবং

হিতৈষীরা সকলেই তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন যতীন্দ্রমোহনকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত পাঠিয়ে তার ব্যারিস্টার হওয়ার পথ প্রথম থেকেই সুগম করে দেন। লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে প্রিয় সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় যতীন্দ্রমোহনের জননীর মন নিতান্ত কাতর হলেও তিনি পুত্রকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

লণ্ডনে যতীন্দ্রমোহন ভর্তি হন কেমব্রিজের ডাউনিং কলেজে এবং অধ্যয়ন বেশ ভাল ভাবেই চলতে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও, খেলাধুলাতেও যথেষ্ট নাম কেনেন আর টেনিস, ক্রিকেট এবং নৌকা-চালনায় প্রতিনিধিত্বের বিশিষ্ট আসন অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনে, প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যাবে যে তিনি আদর্শ খেলোয়াড়ের মতন জয় পরাজয়ের উর্ধ্বে উঠে সর্বদা সব অবস্থায় থাকতেন ধীর, স্থির, অবিচলিত চিত্ত।

প্রগাঢ় বুদ্ধি এবং মনোরম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, অল্পদিনের মধ্যেই যতীন্দ্রমোহন ইণ্ডিয়ান মজলিস এবং ইস্ট ওয়েস্ট সোসাইটিতে তর্কালোচনায় সুনাম অর্জন করে এই দুই সংস্থার সভাপতিও হন। এই সময় তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন গুরুসদয় দত্ত যিনি পরে আই সি এস হন এবং সামাজিক কাজে, বিশেষত বাংলাদেশে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যশস্বী হন।

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও যতীন্দ্রমোহনের আলাপ হয় কেমব্রিজে 1907 সালে। পরে, যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে দুজনেই সংগ্রামীদের পুরোধা হন তখন সেই বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। স্মৃতিচারণ করে জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে (1936) লেখেন "কেমব্রিজে আমার সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ভারতীয় কংগ্রেসে প্রচুর কাজ করেন। আমার কেমব্রিজ যাওয়ার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রমোহন ভারত প্রত্যাগমন করেন। সাইফুদ্দিন কিচলু, সৈয়দ মহম্মদ এবং অসাদুক আহমদ শেরওয়ানি আমার সহপাঠী ছিলেন।"

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (1905-1907) সারা দেশে সাড়া জাগায় এবং তার জের ব্রিটেনেও পৌঁছে যায়। স্বভাবতই তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায় কেমব্রিজের ভারতীয় মজলিসে। সেই সময় কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা বিলেতেই ছিলেন, যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় এবং গোখেল। মজলিসের আমন্ত্রণে তাঁরা কেমব্রিজে যান এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনার পর যতীন্দ্রমোহন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।

কর্মজীবন

যতীন্দ্রমোহন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করেন 1910 সালে। আইনের জটিলতা অনুধাবন এবং ব্যাখ্যায় বিচক্ষণ বলে তাঁর আশাপ্রদ কর্মজীবনের আরম্ভ ছিল অঙ্গীকারপূর্ণ। অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রবল বিক্রমশীল ব্যারিস্টার হিসেবে

বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কর্মক্ষেত্র তাঁর কলকাতা হলেও, মাঝে মাঝেই তিনি স্থানীয় ওকালতিতে স্বনামধন্য পিতার সঙ্গে সময় কাটাতে আর সেই সুযোগে তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে ওকালতির কর্মধারা লক্ষ্য করতে চট্টগ্রামে যেতেন।) কলকাতায় ওকালতি আরম্ভ করার সময় তাঁর আয় অল্প ছিল। আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সুখ্যাত নেতা এবং 'রাষ্ট্রগুরু' নামে স্বীকৃত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে এবং সৌজন্যে রিপন ল কলেজে আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সহকর্মী হিসেবে যাত্রামোহন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ 'বন্ধু'।

আদালত এবং অধ্যাপনার মাঝখানে যতীন্দ্রমোহন অপার আনন্দে সময় কাটাতেন তাঁর স্ত্রী নেলী এবং দুই সন্তান শিশির আর অনিলের ছোট্ট সংসারে (তৃতীয় পুত্র অমল শৈশবেই মারা যায়)। তিনি ছোট ভাই রমেন্দ্রেরও যথেষ্ট দেখাশোনা করতেন।

আনন্দ সমারোহে দিন কাটত। মাঝে মাঝে সকলে মিলে বনভোজনে যেতেন শহরের বাইরে। তাছাড়া, খেলাধুলায় ছিল ওঁর অসীম আগ্রহ এবং ক্যালকাটা ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন তিনি। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল টেনিস, হকি এবং ক্রিকেট (পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে)। সবার ওপর ছিল বিভিন্ন প্রসঙ্গে বই পড়ার পরম আনন্দ। যেমন আইন, রাজনীতি, কূটনীতি — যার ফলে পরিণত মন এবং বুদ্ধি নিয়ে তিনি অনায়াসে তাঁর চারপাশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মুখোমুখি হতেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হন। নিঃসঙ্গ কারাজীবনে এই বই পড়ার অভ্যাস তাঁকে সঙ্গদান করতো।

রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহনের অভিষেক, বলা যেতে পারে, একটি বিবর্তনের ধারা বেয়ে। সর্বপ্রথম তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের, বিশেষ করে বঙ্গ সমস্যা আলোচনার মুখ্য কেন্দ্র বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের প্রতি তাঁর আগ্রহের সূত্রে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয় 1888 সালে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলার বিভিন্ন নেতা এবং নামকরা নাগরিক, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আইনজীবী (যেমন ছিলেন সেই সময়কার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে)। এই প্রতিষ্ঠানে সাধারণত আলোচিত হত জেলার সমস্যা। বিভিন্ন জেলাশহরে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত বলে জনতার মনে জাতীয় জাগরণ সহজ হত, বিশেষ ভাবে শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং আর্থিক সমস্যা প্রসঙ্গে।

যতীন্দ্রমোহন বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সে প্রথম যোগ দেন ফরিদপুর অধিবেশনে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে 1911 সালে। নির্বাক দর্শক নয়, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত তরুণ নেতা, পরবর্তী অধিবেশনের আহ্বান জানালেন চট্টগ্রামে। তাঁর সেই নিমন্ত্রণ সাদরে স্বীকৃত হল। 1912 সালে চট্টগ্রাম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল বছরের চরম সঙ্কটময় সময়ে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সবে রদ হয়েছে এবং ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদিতার স্বীকৃত জাতির উচ্ছেদ সাধন প্রায় অনিবার্য। কাজেই রাজনীতিক পটভূমিকায় এই অধিবেশন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। যার ফলে, অভূতপূর্ব জাতীয়তার জোয়ার সারা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অপরিসীম ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকারের ডাক দিয়ে, বিদেশী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শত শত দেশপ্রেমীর দৃঢ়প্রত্যয়ী, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, চট্টগ্রামের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কুমিল্লার সুখ্যাত ব্যারিস্টার ও জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল রসুল, যাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 1906 সালের বরিশাল অধিবেশন ব্রিটিশ শাসনের বর্বর অত্যাচারে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়। সারা দেশ তখনও বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী আলোড়নে বেদনাবিদ্ধ। চট্টগ্রামের এই অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই দুই সভাপতিরই ভাষণ ছিল দেশভক্তির অপরিসীম আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত — যা সমবেত বিশিষ্ট সভ্যদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু রাজনৈতিক শিরোমণি — যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), অম্বিকা চরণ মজুমদার (ফরিদপুর), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (কলকাতা) ইত্যাদি আরও অনেকে। স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা ছিলেন চট্টগ্রামের তরুণ নেতা চন্দ্রশেখর দে। অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল যখন কাতারে কাতারে ছাত্র এবং যুবকেরা ঘোড়া সরিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্য দুজন নেতার গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে গেল অধিবেশনে।

যতীন্দ্রমোহন (27 বছর বয়স) ছিলেন পিতার সঙ্গে প্রথম সারিতে। সেই সঙ্গে সমসাময়িক গণ্যমান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে অবশ্যই যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ঠিক একবছর পর এই চট্টগ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল অক্ষয়কুমার সরকারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন, যাতে বহু সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং বুদ্ধিজীবী যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ভাবে ঠিক সাহিত্যিক না হলেও এই অধিবেশনের প্রতি যতীন্দ্রমোহন গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক বিজয়কুমার প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীদের সঙ্গে আলাপেরও সুযোগ পান। তাঁরা এই অনুসন্ধিৎসু তরুণ যুবককে খুবই পছন্দ করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক বিজয়কুমার সরকার বর্তমান লেখককে বহু বছর পর বলেছিলেন যে যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে তিনি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্রান্ত আভাস পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এমন কথাও লিখেছিলেন যে তাঁর প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং বীরোচিত কাজের মাধ্যমে বহু সঙ্কটময় মুহূর্তে যতীন্দ্রমোহন কোন কোন ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বড় বড় নেতাদের হার মানিয়েছেন সমস্যা সমাধানের দ্রুততায় ও সুচারুতায়।

সমন্বিত রূপান্তর

ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন যতীন্দ্রমোহনের তরুণ জীবন অপ্রত্যাশিত এক মোড় নেয়। জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে এক অবিস্মরণীয় রোমান্সের মধ্যে তিনি মহাজাগতিক আবেশের সূচনা উপলব্ধি করলেন — যা সময়ের পরিপূর্ণতায় হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে মহাশক্তির আধার।

এই ঘটনার সূত্রপাত হয় কেমব্রিজে মিঃ এবং মিসেস গ্রে নামে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের বাড়িতে — যাঁরা ভারতীয় ছাত্রদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। ভারতীয় ছাত্রেরাও মিসেস গ্রের স্নেহ, ভালবাসা এবং আতিথ্যে আন্তরিক আনন্দ পেতেন। মনে করতেন, প্রবাসেও ওটা যেন নিজেরই বাড়ি। যতীন্দ্রমোহনের ওখানে ছিল নিত্য যাতায়াত এবং মিসেস গ্রের গরীয়সী কন্যা নেলীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। এই ঘনিষ্ঠতায় মিসেস গ্রে যতই খুশি হন না কেন, মনে অবশ্যই তাঁর ভয় ছিল যে এই ভারতীয় যুবককে বিয়ে করলে তাঁর একমাত্র সন্তান সাত সমুদ্রের ওপারে গিয়ে তাঁকে একেবারে একলা করে দেবে।

নিজের ভবিষ্যৎ এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন যতীন্দ্রমোহন অতি সাবধানে সামনে পা বাড়ালেন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি দেশে ফিরলেন 1908 সালে। মনে পড়ে গেল বিলেত যাওয়ার সময় সন্তানের সঙ্গে ব্যবধানের ব্যথা কতখানি তাঁকে কাতর করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন বৃদ্ধ পিতাকে যতখানি সম্ভব সঙ্গ দিয়ে সান্ত্বনা দিতে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করার কথা তিনি বাবার কাছে তুললেন। কথাটা শুনে যাত্রামোহন ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছুতেই সম্মতি দিতে রাজি হলেন না। প্রথমত, যতীন্দ্রমোহনের কর্মজীবন তখনও শুরু হয়নি ফলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আর ওকালতি শুরু করলেই এতটা উপার্জন না-ও হতে পারে যা দিয়ে তিনি বিদেশী পত্নীর ভরণপোষণ সহজেই করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে, সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে একজন ইংরেজ মেয়ে নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন, তা নিয়েও তাঁর মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল।

যতীন্দ্রমোহন ফিরে যাওয়ার পর, নিজের আশঙ্কা এবং সন্দেহ প্রকাশ করে যাত্রামোহন একটা চিঠি লিখলেন মিসেস গ্রে-কে এবং ছেলেকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে দেশে ফিরে আসতে। এইভাবে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে পড়ল। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার অভিপ্রায়ের অমর্যাদা করতে পারলেন না। কাজেই ভগ্নমনে তিনি দেশের পথে পা বাড়ালেন।

ফেরার পথে যতীন্দ্রমোহনের মন বেশ অস্থির হয়ে ওঠে। থেকে থেকেই মনে পড়ে যায় যে নেলী এবং তিনি দুজনেই বিবাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতগামী জাহাজ যখন পোর্ট সৈয়দে পৌঁছল, পুরো বিষয়টি নিয়ে যতীন্দ্রমোহন গভীরভাবে চিন্তা

করলেন, শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, আপাতত দেশে না ফিরে তিনি কেমব্রিজেই ফিরে যাবেন এবং নিজের প্রিয়তমাকে বিয়ে করবেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লণ্ডনগামী একটি জাহাজে চড়ে বসলেন এবং অচিরে মিলিত হলেন তাঁর বাগদত্তার সঙ্গে।

মিসেস গ্রে খুবই অবাক হলেন। প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে ভয় তাঁর যথেষ্টই ছিল। ওঁরা মাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বিয়েটা রেজিস্ট্রি করলেন কেমব্রিজেরই কাছে রয়স্টেনে। তারপর অবশ্য ঐ অবধারিত সত্যকে শান্ত মনে স্বীকার করে নিয়ে মিসেস গ্রে নব দম্পতিকে ঐকান্তিক আশীর্বাদে গ্রহণ করে পরদিনই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। বহু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অকুণ্ঠ হৃদয়ে নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানালেন ওই অনুষ্ঠানে।

এদিকে নির্দিষ্ট জাহাজে যতীন্দ্রমোহন না আসায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে যাত্রামোহন টেলিগ্রাম করলেন কেমব্রিজে। যতীন্দ্রমোহন অবশ্য ইতিমধ্যেই বিবাহের সংবাদ দিয়ে পিতাকে জানিয়েছেন কোন রকম চিন্তা না করতে আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন যে এই বিবাহে যৌথ পরিবারের কোন রকম অসুবিধা কখনও হবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস গ্রে-র মনও সহজ হয়ে উঠল। প্রত্যয় জন্মাল যে বিয়েটা সুখেরই হবে।

সংশয় এবং অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ক্রমশই দূর হতে লাগল। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রামোহন এবং সংসারের প্রায় সকলেই পুত্র এবং তাঁর ইংরেজ পত্নীকে সাগ্রহে স্বাগত জানালেন। আর নেলীও আস্তে আস্তে তাঁর নতুন জীবন এবং সম্পূর্ণ অজানা পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ আনন্দে মিশে গেলেন। শুধু তাই নয়, পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে খাঁটি 'বিলেতি মেমসাহেব'টি সারা সংসারকে তাক লাগিয়ে, ধীর এবং শান্ত ব্যক্তিত্বে, সহজ ও সরল আচরণে প্রত্যেকটি মানুষকে মুগ্ধ করে, সকলের নয়নমণি হয়ে উঠলেন। আনন্দ পরিবেশে সংসার ভরে উঠল। যাত্রামোহন ব্যক্তিগত আনন্দ প্রকাশ করে মিসেস গ্রে-কে জানালেন যে তাঁর সুশীলা কন্যা এ সংসারে অপরিসীম আনন্দের উৎস এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে পুত্রবধূ তাঁর সন্তানের জীবনে পরম শক্তি হয়ে ওঠার পূর্ব অঙ্গীকার। ওদিকে যতীন্দ্রমোহন পারিপার্শ্বিক সানন্দ স্বীকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বুঝলেন তাঁর ভালবাসা ক্ষণিকের মোহ নয়। তার মধ্যে আত্মিক ঐশ্বর্য আছে, আছে সত্যের সৌন্দর্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাঁদের যৌথ পরিবারেই নয়, সংসারের সীমানার মধ্যেই নয়, সামাজিক ব্যাপ্তিতে এবং জাতীয় জীবনেও নেলী ও যতীন্দ্রমোহন হয়ে উঠলেন আদর্শ দম্পতি। বৃহত্তর প্রসিদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসরমান স্বামীর জীবনে নেলী হয়ে উঠলেন তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি। কিছুটা জাগতিক আর অনেকটাই আধ্যাত্মিক আবেশে ওঁদের দাম্পত্য জীবন ক্রমেই ভরে উঠল অবিমিশ্র আনন্দে, নিঃসীম পরিপূর্ণতার সৌরভে।

কেমব্রিজে মিসেস গ্রে দীর্ঘকাল জীবিত থেকে অসীম আনন্দে এবং সগৌরবে দেখে গেলেন ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে তাঁর জামাতার গৌরবোজ্জ্বল অধিনায়কত্ব

এবং তাঁর প্রিয়তম কন্যার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্মান। স্বদেশ ছেড়ে আসার প্রায় পনের বছর পর, 1923 সালে, দুই পুত্র শিশির আর অনিলকে নিয়ে নেলী গিয়েছিলেন তাঁর মা'র সঙ্গে দেখা করতে। দ্বিতীয় বার গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে 1931 সালে হাওয়া বদলের জন্য।

এই প্রসঙ্গে বলা অবশ্যই বাহুল্য হবে না যে কি পরম সৌহার্দে সামাজিক মহল নেলীকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের মাসী, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা কুমুদিনী দাসের (খাস্তগীর) বাড়িতে সেনগুপ্ত দম্পতির সংবর্ধনা উপলক্ষে আহুত এক অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন কলকাতার প্রখ্যাত ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারের কন্যা এবং নারী সমাজের নেতৃস্থানীয়া জ্যোতির্ময়ী দেবী।

তিনি বলেছেন, নেলীকে নিয়ে যতীন্দ্রমোহন যখন সভায় এলেন সকলের একাগ্র দৃষ্টি গেল নেলীর দিকে। বিলাতি বধূ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। রঙিন শাড়ির আবরণে তাঁর শ্বেতাঙ্গ যেন আরও শুভ্র। সেই সঙ্গে তাঁর আচরণের আবেগ এবং মানসিকতার মাধুর্যে তিনি সকলের মধ্যে অনৈক্য ভাবে একক, অনন্য ভাবে মনোরম। সভার শেষে সবাই যখন মুগ্ধ আবেশে চলে গেছে তখন জ্যোতির্ময়ী দেবীকে যতীন্দ্রমোহন বললেন, যে যাই বলুক, তাঁর অন্ততঃ দৃঢ় বিশ্বাস বধূ নির্বাচনে কোন রকম ভুল তিনি করেননি।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ-লেখক অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী যে অন্তরস্পর্শী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার উল্লেখ অবান্তর হবে না।

নেলী সেনগুপ্তা সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ চট্টগ্রামে, পতি-গৃহে মহিলা যেদিন পা দিলেন সেদিন সেখানে যেন স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বলে উঠল। বহু দশক এবং বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে সেই প্রদীপ জাতীয় জীবন প্রজ্জ্বলিত করে আজও প্রদীপ্ত। মহিলার উদ্দীপিত উৎসাহ এবং মাতৃ মননের সমন্বয়ে এই পরম সত্য, সৃষ্টিরই তাৎপর্য।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার পূর্বে বললে অত্যুক্তি হবে না যে নেলী গ্রে-র সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর পরিণয় কিপলিংয়ের সর্বজনপরিচিত কবিতার সম্পূর্ণ খণ্ডন ঃ

'ও! পূব পূর্বই যেমন
পশ্চিম পশ্চিম।
এ দুয়ার মিলনের নেই কোন অবকাশ ...'

বরং প্রত্যাত্তরে বলা যায় ঃ

'পূর্ব এবং পশ্চিমের সমন্বয়
শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য নিদর্শন ...'

দুই

রাজনীতিতে

মুখ্য কেন্দ্র : চট্টগ্রাম

পরবর্তী কয়েক বছর, জাতীয় জীবনে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে ওঁর ওপর তাঁর উদ্দীপিত প্রভাবের পটভূমিকায়, যতীন্দ্রমোহনের বেশ কিছু মুখ্য ঘটনার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। তখন সঠিক ভাবে জানা না গেলেও পরে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বোঝা গেছে যে সেই ঘটনাগুলি ছিল বৃহত্তর ভাবে, আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভেই, দেশভক্ত কিছু যুবককে বিদ্রোহী ঘোষণা করে ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয় এবং বেশ কয়েকজনকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি কুতুবদিয়া নামে এক পরিত্যক্ত দ্বীপে রাজবন্দী করে রাখা হয়। বহুকাল তাঁরা নানান উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন। বিশেষ করে রক্ষাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার। জীবন যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন অনন্যোপায় হয়ে 17 জন বন্দী শাসনকর্তাদের কাছে তাঁদের নালিশ জানাবার উদ্দেশ্যে দ্বীপ থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ নৌকায় আর কেউ বা অশান্ত সাগরে সাঁতার কেটে। শহরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং অন্তরীণ আইন কানুন ভঙ্গের অপরাধে বিশেষ ট্রাইবুন্যালের আদালতে বিচারের জন্য (জুন 1918) পেশ করা হয়।

তখন মনট্যাগু — চেম্‌সফোর্ড সংশোধন কর্মসূচির কারণে সমসাময়িক রাজনীতিক আকাশ বেশ ঘোলাটে ছিল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এবং চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থীদের মতে প্রস্তাবিত সংশোধন ছিল নৈরাশ্যকর, অসন্তোষজনক এবং অগ্রহণীয়। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নেতৃত্বে নরমপন্থীরা মনে করছিলেন যে প্রস্তাবগুলি প্রণিধানযোগ্য এবং পরীক্ষামূলক ভাবে কার্যকর করে দেখা দরকার। এই জটিলতা সত্ত্বেও, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও দেশভক্ত চিত্তরঞ্জন রাজবন্দীদের টেলিগ্রাম পেয়েই তাঁদের পক্ষ সমর্থনের নীতিগত দায়িত্ব সানন্দে স্বীকার করে (8 জুন 1918) বিশেষ ট্রাইবুন্যালে ঐ 17 জন বন্দীর শুনানীর জন্য চট্টগ্রাম চলে যান। তাঁর সহকারী ছিলেন এ কে ফজলুল হক এবং ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহনও সঙ্গে এসেছিলেন অতিরিক্ত সহকারী হিসেবে এবং কতুর্বদিয়া মামলা চলাকালীন প্রায় পক্ষকাল বাড়িতে এবং আদালতে প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

বয়স এবং ওকালতি অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট নবীন হয়েও রাজসাক্ষীদের জেরায় এবং তীক্ষ্ণ বক্রোক্তিতে যতীন্দ্রমোহন কেবল যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা-ই নয়, বিচারকমণ্ডলীর একজনকে এমন স্তম্ভিত করেছিলেন, যা বর্তমান লেখকের আজও মনে আছে। ঘটনাটি এই রকম ঃ

রাজবন্দীদের অন্যতম নালিশ ছিল গায়ে মাখা সাবানের অভাব। একজন রাজসাক্ষীর যখন পূর্ণোদ্যমে জেরা চলছে তখন বিচারকমণ্ডলীর সভ্যটি মন্তব্য করলেন "আমাদের অল্পবয়সে সাবান ব্যবহার তো দূরের কথা, সাবান আমরা স্পর্শই করতাম না।" জবাবের সুযোগটা যতীন্দ্রমোহন ছাড়লেন না। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ ইয়র অনার, সেই জন্যই বোধহয় আজও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নোংরা থাকতেই ভালবাসেন!" আদালত হেসে গড়িয়ে পড়ল। বিচারকগণ নীরবে মাথা নিচু করলেন।

তীক্ষ্ণ জেরায় রাজসাক্ষীদের জর্জরিত করে আর অভিযোগের মুখ্য কারণগুলো গুলিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জন মামলাটাকে নেহাৎই মামুলি প্রতিপন্ন করে বুঝিয়ে দিলেন যে রাজবন্দীরা পালিয়ে আসেননি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিজেদের বাসস্থান, মাসোহারা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক অভাব অভিযোগের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানাতে এসেছেন। কাজেই, আইন অমান্য অথবা অন্য কোন কারণে তাঁদের অভিযুক্ত করার কোনই যুক্তি নেই। তা সত্ত্বেও ট্রাইবুন্যাল তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে আরও তিন মাস কারাদণ্ডের সাজা দিলেন। সম্ভবত সরকারের সম্মান বজায় রাখার নিদর্শন হিসেবে।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রামে এই কুতুবদিয়া মামলার সময় চিত্তরঞ্জন ছিলেন যাত্রামোহনের গৃহ-অতিথি। যাত্রামোহনকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং বয়সে বড় বলে বঙ্গীয় প্রথামতে পায়ের ধুলো মাথায় নিতেন (দেশবন্ধুর জীবনী লেখক হেমেন্দ্র দাশগুপ্তকে যতীন্দ্রমোহন নিজে এ কথা বলেছিলেন।)

আরও বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় যে কুতুবদিয়া মামলার পক্ষকাল চিত্তরঞ্জন কোন রকম পারিশ্রমিক তো নেনই নি বরং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের টাকা তিনি বাইরে থেকে ধার করেছিলেন। এই মামলার শেষে অত্যন্ত জটিল তিন চারটে ফৌজদারি

মামলায় ওকালতির ডাক পেয়েছিলেন 20 থেকে 30 হাজার টাকা পারিশ্রমিকে কিন্তু রাজনৈতিক গুরুদায়িত্বের কারণে অবিলম্বে কলকাতা ফিরে যাওয়ার তাগিদে তিনি তার একটিও গ্রহণ করেননি। প্রখ্যাত রাজনৈতিক 'গুরুর' এই অনুকরণীয় স্বার্থত্যাগের প্রভাব তাঁর নিত্যসঙ্গী যতীন্দ্রমোহনের ওপর নিশ্চয় প্রভূত ভাবে পড়েছিল। যেমন পড়েছিল আরও দু'একটি ঘটনার ফলে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

দেশবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষণ

দেশবন্ধুর চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বক্তৃতার জন্য অবিস্মরণীয়। তার একটিতে ছিল অদূর ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিক নেতৃত্বে যুগান্তকারী পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস, পরে যার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রথম বক্তৃতা তিনি দেন 18 জুন 1918। চট্টগ্রামে বহু গণ্যমান্য নাগরিক এবং অগণিত ছাত্র সমবেত হয়েছিলেন সদরঘাটের বিশ্বম্ভর হলে 'বর্তমান পরিস্থিতি' সম্বন্ধে প্রখ্যাত ব্যারিস্টরের ব্যাখ্যা শুনতে। বস্তুতঃ, প্রসঙ্গটি ছিল মনট্যাগু-চেম্‌সফোর্ড প্রস্তাব, সেগুলোকে কংগ্রেসের চরমপন্থীরা মনে করতেন ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীয়তার অন্তরায় এবং দেশের পক্ষে নিতান্তই হানিকর। এই সভা ডেকেছিলেন চট্টগ্রাম অ্যাসোশিয়েশন আর চিত্তরঞ্জন তাঁর অসীম ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়েছিলেন জনতার জন্য। পুত্র যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাবানুযায়ী যাত্রামোহন ছিলেন সভাপতি।

পুরো নব্বই মিনিট ব্যাপী এই বক্তৃতা চিত্তরঞ্জনের একটি বজ্রানল সৃষ্টির অক্ষয়কীর্তি। ভারতীয় রাজনীতিক উদ্দেশ্য এবং আদর্শের পটভূমিকায় প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সেগুলি অন্তঃসারশূন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ ডিগবাজি খেয়ে প্রস্তাবগুলির সাদর সমর্থনের ঘটনাকে। যে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ এতদিন কঠিন সংগ্রাম করে এসেছেন — এই প্রস্তাবিত সংশোধনে তার অলীক ছায়াটুকুও না থাকা সত্ত্বেও কি করে এবং কেন তিনি এগুলো সমর্থন করলেন? দেশবন্ধু বিস্তারিত ভাবে সুরেন্দ্রনাথের অতীত বক্তব্য উদ্ধৃত করলেন তাঁরই পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী' থেকে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন তাঁর জাত বদল। একজন আইনজীবীর শাণিত যুক্তির আলোয় প্রস্তাবগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণে এমন ভাবে নিজের আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন যে, যে মানুষটিকে সমগ্র দেশ 'রাষ্ট্রগুরু' বলে অভিহিত করত তাঁকেই বলে বসলেন 'ভণ্ড!' ''আমি কিছু কঠোর কথা বলেছি" দেশবন্ধু বললেন, "কারণ আমি কঠিন ব্যথা পেয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি সাধারণ মতবাদকে অবজ্ঞা করে উনি পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন।"

চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে মানুষ শুধু মুগ্ধই হয়নি, অভিভূত আনন্দের হর্ষধ্বনিতে হল প্রায় ফেটে পড়েছিল। মুগ্ধ শ্রোতারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন যখন চট্টগ্রামের নবীনতম নেতা যতীন্দ্রমোহন তাঁর নির্ধারিত রাজনীতিক গুরুর বক্তৃতায় অভিভূত আবেগে চিত্তরঞ্জনকে সংবর্ধনার প্রস্তাব জানিয়ে বললেন যে দেশবন্ধুর বক্তব্যের ফলে, ভারতের রাজনীতি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে, অচিরে অগ্রগতির পথে দ্রুতবেগে চলবে — আর তারই সূচনা ওঁরই জন্মক্ষেত্র চট্টগ্রামে হল — এর চেয়ে বেশি আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? এটাই যতীন্দ্রমোহনের প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা। এবং জনমনে কি অসীম প্রভাবই না তা বিস্তার করেছিল!

দেশবন্ধু দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন চারদিন পর, 22 জুন 1918। কংগ্রেসের মধ্যবর্তী গোষ্ঠী এবং বিশেষ ভাবে সুরেন্দ্রনাথকে আর একপ্রস্থ ব্যঙ্গ করে উনি বলেন "প্রকৃতপক্ষে কোন নেতারই কোন মূল্য নেই। দেশের আসল শক্তি, সত্যিকার প্রতিনিধি হল তারা যারা সঠিক পথ বেছে নেয় বেঠিককে বাদ দিয়ে।" আরও বললেন, "আমরা এমন কিছু কখনই স্বীকার করে নেব না যা আমাদের জন্মগত দাবীকে অস্বীকার করে। সত্যিকার সংশোধন প্রস্তাব সেইটাই যা দেশের জন্মগত অধিকার এবং দাবিকে বিনা শর্তে স্বীকার করে নেবে। আমি দয়া চাই না, দাবির বজ্রমুষ্টি তুলে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।"

পরিশেষে চিত্তরঞ্জন প্রভূত প্রশংসা করলেন যতীন্দ্রমোহনের আর তাঁর প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। বললেন যে গত 15 দিন যতীন্দ্রমোহন তাঁর পাশে পাশে ছিলেন 'আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ' যাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজ তিনি ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন বলেই অকুণ্ঠ ভাবে বলতে পারছেন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। পরে চট্টগ্রামবাসীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে উনি ফিরে যান কলকাতা।

দেশবন্ধুর জীবনী লেখক (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) বলেছেন যে চট্টগ্রামের বক্তৃতাই ওঁর জাতীয় নেতা হওয়ার প্রথম সূচনা এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃষ্ট স্বার্থত্যাগের প্রথম প্রস্তুতি।*

প্রথম জাগরণ (1920-21)

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিতে যতীন্দ্রমোহনের প্রথম পদক্ষেপ স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন এক অবিস্মরণীয় সময়ে, যাকে বলা যায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরিসমাপ্তির সূচনা।

---

* দেশবন্ধু স্মৃতি : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

সামান্য ভাবলেই দেখা যায়, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যপী ব্যাপক এবং গভীর ভাবে প্রথম জাগরণ ঘটে 1905-06 সালে স্বদেশী আন্দোলনে। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কারজনের বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাবই প্রথম গণ আন্দোলনের আগুন জ্বালায়। যাঁদের বজ্রকণ্ঠ নতুন আলোয় দেশভক্তি দেখিয়ে নির্ভীক মনে সর্বস্ব ত্যাগের ডাক দিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিলক, অরবিন্দ, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ।[1]

অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম নতুন রূপ নিল (1920-21) মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায়। 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ' শ্লোগান সারা দেশবাসীর মনে গেঁথে গেল আর জনতা জেগে উঠল বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে। ঠিক এই সময় কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের ঠিক পূর্বে মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মহান স্থপতি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রয়াণ (সেপ্টেম্বর 1920) সমগ্র দেশকে দিল শোকাচ্ছন্ন করে।

অদম্য মুক্তি সংগ্রামী তিলক ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্র জুড়ে ছিলেন প্রায় দুই দশক (1900-20) এবং স্যার ভ্যালেনটিন চিরোলের[2] মতে তিনি ছিলেন 'ভারতের অশান্তির জনক।' কিন্তু গান্ধীজীর মতে তিনি ছিলেন 'আধুনিক ভারতের নির্মাতা।' আসলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি তিলক ছিলেন সংগ্রামশীল জাতীয়তার পরম পূজারী। সর্বোপরি তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ভারতের প্রথম এবং প্রধান দাবী, 'স্বরাজ ভারতের জন্মগত অধিকার' যা পরে কার্যে পরিণত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমবেত জনতার অভ্যুত্থানে। এ কথা খুব ভুল নয় যে অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। তবে, তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের ঐ স্থির-সংকল্প মানুষটি কখনও গুজরাব নেতার আন্দোলনের অন্তরায় হননি।

যাই হোক, বিধির বিধানে গান্ধীযুগ আরম্ভ হল তিলক যুগ শেষ হওয়ার পর।

তাহলেও তিলকের মৃত্যু সংবাদে গান্ধীজী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন উঠল — তিলকের পর কে?

অচিরেই গান্ধীজীর ঐ নতুন ধারার ডাকে সাড়া দিল নবীন এবং শক্তিশালী সংগ্রামীরা। সমগ্র দেশ থেকে দেশপ্রেমিক এল দলে দলে — যেমন এলেন মোতিলাল এবং পুত্র জওহরলাল আর জালিয়াঁওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর আরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালেন ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক অঞ্চলে।

অন্য সব প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ সাড়া দিল সবার আগে, সকলের বেশি।

---

1. 1921সালের আন্দোলন : কিছু স্মৃতি, ভারত সরকার প্রকাশনা 1971, আর আর দিবাকরের রচনা থেকে।

2. স্টেট্সম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়, 21 ডিসেম্বর, 1910।

আর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সব কিছু তুচ্ছ করে সর্বস্বত্যাগের সাধনায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক বৃহত্তর ভাবে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কতখানি নাড়া দিয়েছে। কেউ এল প্রথম ডাকে, কেউ বা পরে; কিছু অবসর নিয়েছেন, কেউ কেউ ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁদের দান এবং ত্যাগ আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে জাতির মনে। প্রথম সারির যে সমস্ত নেতা চিত্তরঞ্জনকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, পীর বাদশাহ মিঞা, জীবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অনিলবরণ রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ।

প্রত্যাশিত ভাবেই বাংলার যোগদান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাসকদের বিরুদ্ধাচরণে বাংলাই ছিল সব প্রদেশের অগ্রণী, কর্মে মহান, ত্যাগে মহৎ। নথিপত্র অনুযায়ী সারা ভারতের 1500 আইনজীবী আন্দোলনকারীদের মধ্যে (শুধু বাংলারই সংখ্যা ছিল 900। আন্দোলনে গ্রেপ্তার এবং কারাবরণের সংখ্যা) বাংলায় ছিল সবার বেশি। সৃষ্টিশীল কাজেও বাংলা ছিল অদ্বিতীয়।[1])

বাংলার সব জেলার মধ্যে চট্টগ্রামের সাড়া এবং কর্মসাধনা ছিল এত বেশি এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজী পূর্ব সীমান্তে এই প্রাণবন্ত জেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তাঁর স্বাক্ষরিত 'সবার আগে চট্টগ্রাম' শীর্ষক রচনায় (12 জানুয়ারী 1922 সংখ্যা)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পরই অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম যোগ দেয় চট্টগ্রাম — বিক্ষিপ্ত আলোড়ন নয়, ব্যাপক অভিযান।

বাংলার জেলায় জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের নীতি এবং আদর্শ প্রচারের অভিযানে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে এসে পৌঁছলেন 14 মার্চ 1921। এলেন যতীন্দ্রমোহন এবং নেলীও। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ছিলেন সুপণ্ডিত অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার, যিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও নেলীর বাড়িতে অতিথি হলেন। এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর পরিচয় পূর্বেই হয়েছিল। তাঁর মনে পড়ে গেল বছর চারেক পূর্বেকার কথা যখন এই চট্টগ্রামেই রাজনৈতিকতায় নতুন উদ্যমের ডাক দিয়ে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা সারা ভারতের চিত্ত জয় করেছিল। চট্টগ্রামে এসেই চিত্তরঞ্জন যোগাযোগ স্থাপন করলেন মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরি, কাজেম আলি, মনিরাজ্জামান ইসলামাবাদি প্রভৃতি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে। আন্দোলনকারীদের ইতিমধ্যেই একটা মোটামুটি ধারণা ছিল আইন এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্তদের মধ্যে আন্দাজ কত জন সর্বস্বত্যাগের অঙ্গীকার

1. অরুণচন্দ্র গুহের প্রবন্ধ, সানডে, 17 জানুয়ারী, 1971

নিয়ে, আপন আপন কাজ ছেড়ে পুরোপুরি ভাবে দেশমুক্তির সাধনায় ব্রতী হবেন। চিত্তরঞ্জনের প্রখর দৃষ্টি ছিল যতীন্দ্রমোহনের প্রতি, যাঁকে তিনি পরম বিশ্বাসে এবং আন্তরিক আস্থায় জানতেন যে আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষে উপযুক্ত এবং তাঁর নিজের সহকারী হিসেবে অতুলনীয়। চারিত্রিক গুণে এবং পিতা যাত্রামোহনের ঐতিহ্যের উপযুক্ত বাহক হিসেবে বহু বছর আগেই তাঁর চিত্ত জয় করেছিলেন। আলাদা ভাবে তিনি যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আলোচনা করলেন — অন্তত তিন মাস তাঁর আইন ব্যবসা বন্ধ রাখার কথা, যাতে আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব তিনি সুদৃঢ় এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে করতে পারেন।

চিত্তরঞ্জনের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত এবং দেশের কাজে তাঁর সর্বস্বত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন কিছুটা দোটানায় পড়লেন — আইনজীবী হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং ক্রমবর্ধমান সংসারে ব্যয় নির্বাহের কথা ভেবে। শেষ পর্যন্ত দেশের ডাক এবং গুরুর প্রেরণা তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল স্বরাজ সংগ্রামের বাস্তবতায়।

চট্টগ্রামে আন্দোলনের মোড় ফিরল চিত্তরঞ্জনের আগমনে। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় স্থির হল পথ এবং পদ্ধতি যাতে আন্দোলনে জনসাধারণের যোগদান দ্রুত এবং দৃঢ় হয়। আলোচনার পর এক জনসভায় আন্তরিক আবেদনে দেশবন্ধু ডাক দিলেন জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধবনিতাদের, সব কিছু তুচ্ছ করে, সর্বস্ব ত্যাগের অঙ্গীকার নিয়ে দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে 'এক বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ' সফল করতে। অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারও বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রদীপ্ত ভাষায়। ফল হল বৈদ্যুতিক ভাবে চমকপ্রদ। বেশ কিছু আইনজীবী যেমন মহিমচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র গুহ, মোক্ষদারঞ্জন কানুনগো, রমেশচন্দ্র রক্ষিত এবং আরও অনেকে সাময়িকভাবে আপন আপন আইন ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন সভাকে। শাজিম আলি মিঞা, ত্রিপুরাচন্দ্র চৌধুরী, মৌলানা মনিরাজ্জামান ইত্যাদি এগিয়ে এলেন তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সব শেষে চিত্তরঞ্জন যখন সভায় ঘোষণা করলেন* যে যতীন্দ্রমোহন (সভায় উনি কিছু পরে আসেন) তাঁর আইন ব্যবসা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা স্থির করেছেন তখন সমবেত জনতা সমস্বরে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন।

পরিস্থিতি আরও কিছু প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পরদিন যখন চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের সহ-অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে

---

* কম আশ্চর্যের কথা নয় যে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর 1920) সবিশেষ ব্যক্তিগত আপত্তি সত্ত্বেও অল্পকাল পরেই নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেম্বর 1920) চিত্তরঞ্জন নিজের মত আমূল পরিবর্তন করেন। প্রতিবাদীদের অমোঘ সমর্থক চিত্তরঞ্জন, নাগপুর গিয়েছিলেন বাংলা থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধিদের দল নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সঙ্কল্পের বিরোধিতা করতে কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘ ব্যক্তিগত আলোচনার পর তিনি নিজের মত সম্পূর্ণ বদলে ফেলেন।

দিলেন যে তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশভক্তির এই অনবদ্য দৃষ্টান্তে, আনন্দে অধীর দেশবন্ধু তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনায় জড়িয়ে ধরলেন। দুই আবেগপ্রবণের আনন্দাশ্রু উপস্থিত সকলের মন সিক্ত করে দিল — বিশেষ ভাবে যতীন্দ্রমোহন এবং অধ্যাপক হেমন্ত সরকারের। বস্তুত জনপ্রিয় শিক্ষক এবং শ্রদ্ধেয় নৃপেনবাবুর পদত্যাগ আর যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব স্থানীয় ছাত্রদের এমন গভীর ভাবে নাড়া দিল যে দু'এক দিনের মধ্যেই তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সমবেত ভাবে নেমে এলো পথে এবং তাদের শোভাযাত্রা আর শ্লোগানের বাহুল্যে সারা শহর জেগে উঠল নতুন উত্তেজনার নিবিড় ছন্দে।

তিনদিন পর চিত্তরঞ্জন ফিরে গেলেন কলকাতায় আর যতীন্দ্রমোহন থেকে গেলেন আন্দোলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন, শোভাযাত্রা এবং জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি ছাড়াও প্রয়োজন ছিল অচিরে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হল 20 মার্চ। নেতৃত্বে দ্বিতীয় স্থান নিলেন অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মহিমচন্দ্র দাস। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন শেখ-ই-চাটগাঁও কাছেম আলি, মহিমচন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র রক্ষিত, রমেশচন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার সেন, যামিনীরঞ্জন বসু, মোক্ষদারঞ্জন কানুনগো, হরিশচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র গুহ, কামিনী কুমার ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (এঁরা সকলেই নিজ নিজ ওকালতি ব্যবসা বন্ধ করে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন) আর ছিলেন ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মনিরাজ্জামান ইসলামাবাদি, শাহ বেদুল আলম, আলি আহমেদ ওয়ালি, আমানত খাঁ, ডাঃ বেণীমোহন দাস, ডাঃ মহিমচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ প্রমুখ। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ছিলেন : সূর্য কুমার সেন ('মাস্টারদা' নামে পরে প্রসিদ্ধ), অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন (পরে চট্টগ্রাম বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা), চারুবিকাশ দত্ত, ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী, সতীভূষণ সেন (প্রাক্তন বিপ্লবী সঙ্গী সমেত), সতীশ নাগ, সঞ্জীব সেন, বরদাপ্রসাদ নন্দী, এক্রামুল হক, জ্যোতিষ চন্দ্র কর, বিনোদ সেন, সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত, সুশান্ত চৌধুরী, শচীন দাস, বিনোদ দত্ত ইত্যাদি।

জেলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই সূর্য সেন, গিরিজা চৌধুরী, অনন্ত সিংহ এবং আরো অনেকে মিলে 'স্বদেশ সঙ্ঘ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান গঠন

এইভাবে তিনি সভাকে অবাক করে দেন। প্রতিবাদীদের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে কিছু সংশোধন এবং অদল বদলের পর তিনি নিজেই আন্দোলন প্রস্তাবকারীদের নেতৃত্ব করেন। ফলে কিছু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে :

কলকাতা ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর বিস্তৃত আইন ব্যবসা এবং রাজকীয় জীবনধারা সম্পূর্ণ

করে মহা-উৎসাহে শুরু করে দিয়েছিলেন বিলাতি জিনিস বর্জন করে স্বদেশী ব্যবহারের প্রচার। নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি কিছুটা এই রকম ছিল ঃ

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাইরে অসহযোগ আন্দোলনের মর্ম প্রচার, বিলাতি জিনিস বর্জন করে স্বদেশীর ব্যবহার, চরকা কাটার চলন, স্কুল কলেজ বন্ধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মদ্যপান না করা ইত্যাদি প্রচারকার্যের জন্য প্রাত্যহিক নিয়মে শোভাযাত্রা। এই সব কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলেও কেন্দ্র গঠিত হল, যার দায়ভার নিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, বিশেষ ভাবে কিছু আইনজীবী যাঁরা ওকালতি বন্ধ করে এই কাজে ব্রতী হলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু উল্লেখনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যামিনীমোহন বসু (পাতিয়া), প্রসন্নকুমার সেন (মধ্যাঞ্চল), কামিনীকুমার ঘোষ (দক্ষিণাঞ্চল) ইত্যাদি। এই ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের আগুন দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল সারা জেলায়।

চট্টগ্রামে এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় হল এই যে মুসলমান প্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, কাতারে কাতারে মানুষ আন্তরিক উৎসাহে যোগ দিল দেশপ্রেমী আদর্শের একই পতাকার নিচে, মুক্ত প্রাঙ্গণে, ভেদাভেদের কোন বালাই না রেখে। দেখা গেল যে বর্মা অয়েল কোম্পানির অধিকাংশ সভ্য — যাঁরা প্রথম বড় আঘাত হেনেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুসলমান। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যেরা সমতলে পা ফেলেছিলেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এমন কি শিখ এবং উত্তরাঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসেছিলেন অসীম ত্যাগ সাধনার অঙ্গীকার নিয়ে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কৃপালদাস উদাসী, গঙ্গারাম পোদ্দা, শামসুদ্দীন সাসারামি ও অন্যান্যরা।

কংগ্রেস কার্যাবলীর বৈশিষ্টপূর্ণ গঠনমূলক কাজ ছিল, দিন-মজুর, ক্ষেত-খামারের কর্মী, কারখানার কর্মী, মেথর, মুচি, পিয়ন, খানসামা, কুলি, মাঝি ইত্যাদি অতি সাধারণ মানুষদের নৈরাশ্যজনক জীবনধারা এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন। এই সব অতি সাধারণ নিষ্পেষিত মানুষদের উন্নতির প্রতি যতীন্দ্রমোহনের ছিল অসীম উৎসাহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যে সব অঞ্চলে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্য অথবা তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনে সভা ডাকা হত সেখানে নিয়মিত বক্তৃতা এবং বিদেশী বর্জনের উদ্দেশ্যে বিলাতি মালে আগুন লাগানো ছাড়াও নিয়মিত তিনি দিন-মজুর আর খেটে খাওয়া মানুষদের আলাদা সভা ডাকতেন। সেই সব সভায় যতীন্দ্রমোহন নিজে তাদের নির্যাতিত জীবন আলোচনা করে নতুন ধারা প্রবর্তনের পথ ও পদ্ধতি

ভাবে পরিত্যাগ করে জনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন সর্বান্তকরণে। ওঁর স্বার্থ ত্যাগে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওঁর সাধনাদীপ্ত নেতৃত্বে আর গান্ধীজীর ঐকান্তিক প্রভাবে অসহযোগ আন্দোলনের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে।

সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আলোকোজ্জ্বল দিনের আভাস দিতেন। ক্রমেই তারা 'যতীন ব্যারিস্টার'কে (এই নামেই উনি সকলের মধ্যে পরিচিত ছিলেন) তাদের ত্রাণকর্তার আসনে বসিয়ে ধ্রুবতারার মতন তাঁকে অনুসরণ করত।

এই সব কার্যকলাপে যতীন্দ্রমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় (যদিও অন্য প্রসঙ্গে ব্যক্ত) বা গান্ধীজীর মতে সাধারণ মানুষের অন্য রূপ অথবা চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে (তাঁর ভবানীপুর কনফারেন্সের ভাষণ, 1914) আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য 'এবার ফিরাও মোরে ...' কবিতার আদর্শ অনুযায়ী — সর্বসাধারণের জন্য 'স্বরাজের' গঠনমূলক আদর্শকে 'জনতা ব্র্যাণ্ডে' রূপান্তরিত করা।

প্রথম বিজয়

এই চরম সময়, বস্তুত বেশ কিছু আগে থেকেই বর্মা অয়েল কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা বুলক ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং) কর্মী এবং মজদুরদের মধ্যে মাইনের হার বাড়ানো এবং কর্ম ব্যবস্থার উন্নতির দাবীতে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। যতীন্দ্রমোহনকে তাঁরা আবেদন জানালেন তাঁদের পক্ষ সমর্থন করতে। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যতীন্দ্রমোহন সময় নিলেন তাঁদের দাবি এবং নালিশ পরীক্ষা করে দেখার জন্য। কারণ, কোন রকম অন্যথা হলে তাঁদের অবস্থার আরও অবনতি এবং ফলে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁদের সাংসারিক দুরবস্থা আরও কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি তাঁদের আরও বুঝিয়ে দিলেন যে অনতিবিলম্বে প্রয়োজন সম্মিলিত পথে কর্মী সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। তাঁদের এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী — সেই কর্তৃপক্ষকে — তাঁদের প্রতি অন্যায় করা সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া একান্ত দরকার। সেই সভায় কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মী, বিনোদ চক্রবর্তী, সোৎসাহে সহকর্মীদের ডাক দিলেন সমবেত ভাবে যতীন্দ্রমোহনের উপদেশ মেনে নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হতে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তৎক্ষণাৎ, সেই সভাতেই 'বি ও সি কর্মী ও মজদুর সংঘ' গঠিত হল যতীন্দ্রমোহনকে সভাপতি করে, প্রলম্বিত নিষ্পেষণের পর নতুন আশার আলোয় উদ্ভাসিত সভা আনন্দের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

সংঘ হল বটে, কাজটা কিন্তু কোন ভাবেই সহজ ছিল না। এই সভা এবং সংঘ গঠনের সংবাদে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বিচলিত হয়ে উঠল। পরদিনই বিনোদবাবুকে এজেন্টের ঘরে ডেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হল কেন তিনি কোম্পানি এবং কর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের উত্তেজিত করে ইউনিয়ন গঠনে সাহায্য করেছেন। ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব সহজ এবং শান্ত মনে স্বীকার করে নিয়ে বিনোদবাবু বোঝাতে চেষ্টা করলেন ইউনিয়নের গুরুত্ব, এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত

কোম্পানির স্বার্থবিরোধী কাজ করার অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। এজেন্ট মার্টিন নির্দেশ দিলেন শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিতে। বিনোদবাবু ঐ ধরণের চিঠি দিতে অস্বীকৃত হলেন। সেই সময়কার সাহেবি মনোবৃত্তিতে, মার্টিন সাহেব মান মর্যাদার মাত্রা হারিয়ে বিনোদবাবুর বিরুদ্ধে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আরোপ করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুকুম দিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া হল। দীর্ঘদিন পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, বিনোদবাবু সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

হঠাৎ এইভাবে বিনোদবাবুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করায় কোম্পানির কর্মচারী আর কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংঘের এক জরুরি মিটিংয়ে সাধারণভাবে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, 17 এপ্রিল। বিনোদবাবুর বরখাস্ত হওয়া আর সংঘের ধর্মঘট সিদ্ধান্তের সংবাদ গেল যতীন্দ্রমোহনের কাছে। সভাপতি হিসেবে কর্মীসংঘের এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সানন্দে স্বীকার করে নিয়ে, অসহযোগ আন্দোলনের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সমস্ত দায় ও দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়ে নিলেন। ভারতীয় ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘটের গুরুত্ব এবং ফলাফল সম্বন্ধে সকলেই, বিশেষ ভাবে, শ্রমিক এবং কর্মী সংঘ কৌতূহলী এবং উদগ্রীব ভাবে সচেতন হয়ে উঠলেন। যতীন্দ্রমোহনও বুঝে নিলেন এই ধর্মঘটের প্রাধান্য। কারণ, তিনি ভাল ভাবেই জানতেন যে ধর্মঘটের ফলে বড় ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অচল হলে শাসনতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাদের সাহায্য করতে কোন ভাবেই দ্বিধা করবে না। তিনি সবাইকে সকাতরে আবেদন জানালেন চিন্তায় কথায় এবং কাজে অহিংসা নীতি সর্বতোভাবে অবলম্বন করতে যাতে আইন-কর্তারা কিছুতেই প্রত্যাঘাতের কোন অজুহাত না পান।

নেতার আহ্বানে সর্বান্তকরণে সাড়া দিয়ে বি ও সি-র দু'হাজার কর্মচারী, কর্মী এবং শ্রমিক নির্ধারিত দিনে শুরু করলেন ভারতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অভিযান, যার ফলে একটি বৃহত্তম ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি টলে উঠল। চারিদিকে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। যতীন্দ্রমোহন শুধু দৈনন্দিন ধর্মঘটের দায় সামলালেন না, অভাবগ্রস্ত বহু শ্রমিক পরিবারের জন্য অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করলেন।

বি ও সি শ্রমিক সংঘ চালু করলেন 'ধর্মঘটী সাহায্য ভাণ্ডার' এবং জেলা কংগ্রেস এগিয়ে এল অকুণ্ঠভাবে তাঁদের সাহায্যে। জনসাধারণের অর্থ সাহায্য এল অসীম আগ্রহে, উদার চিত্তে।

ধর্মঘট যখন চরমে তখন ঘটল আর এক অভূতপূর্ব ঘটনা। 'লঙ্কা' নামে বি ও সি-র এক যাত্রী এবং মালবাহী জাহাজ এল চট্টগ্রাম বন্দরে। ধর্মঘটী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিতে জেটির কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য শ্রমিক যেমন কুলি-মজুর, মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি সকলেই ঐ জাহাজ থেকে মাল বা যাত্রী নামাতে অস্বীকৃত হলেন সমবেত ভাবে। চলতি স্লোগান 'বন্দে মাতরম্' আর 'আল্লা হো আকবর' — ধ্বনিতে আকাশ,

যেন বিদীর্ণ হল। এমন কি জাহাজের কর্মীরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়ে সাঁতার কেটে তীরে চলে এল নোঙর করা জাহাজের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে। অভূতপূর্ব এক অচল অবস্থা ঘনিয়ে উঠল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে। জেটির ধারে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রমোহন অসীম উৎসাহে দেখলেন আন্দোলনের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া।

ঠিক ঐ সময় ঐ কোম্পানিরই আর এক মালবাহী জাহাজ 'ভদ্রা' চিটাগাং বন্দর এলাকার দিকে এগিয়ে আসছিল। বিপদ বুঝে জাহাজের ক্যাপটেন চট্টগ্রাম বন্দরে মাল নামানোর আশা ছেড়ে চলে গেলেন আকিয়াবের দিকে। সাহসের মূলমন্ত্র 'সতর্কতা' বা চলতি ভাষায় যাকে বলে 'সাবধানের মার নেই।'

এটা ঘটল পয়লা মে। ধর্মঘটের দু'সপ্তাহ উত্তীর্ণ। ধর্মঘটীরা আন্দোলনের অগ্রগতিতে উৎফুল্ল হলেও শেষ পর্যন্ত কি হবে সে নিয়েও কিছু কম উদ্বিগ্ন নয়। ওদিকে দিনের পর দিন প্রচুর লোকসান সত্ত্বেও কোম্পানি তাদের মনোভাবে অটল। আর এই সব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে জেলা শাসকেরাও সন্ত্রস্ত। যদিও ধর্মঘট ছিল সম্পূর্ণ ভাবে শান্তিপূর্ণ তবুও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 144 ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করলেন যতীন্দ্রমোহন এবং আরও 11 জন কর্মীর ওপর — শহরে বা শহরতলিতে কোন রকম শোভাযাত্রা বা মিটিং করা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে (3 মে 1921) আরও একটা অনুরূপ হুকুম জারি হয়ে গেল যে জেলা শাসকের অনুমতি ছাড়া কোথাও কোন রকম মিটিং করা চলবে না।

ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষ সমর্থনে সরকারের এই অতর্কিত আক্রমণাত্মক হস্তক্ষেপে অতি সাধারণ মানুষও উত্তেজিত হয়ে উঠল। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে স্থানীয় নেতৃবর্গ স্থির করলেন সরকারি হুকুমের প্রতিবাদ জানাবেন সেগুলো সরাসরি অমান্য করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি হুকুম অমান্য করে অগণিত জনতার এক সাধারণ সভা হল। ঐ সভায় যতীন্দ্রমোহন এবং অন্য 11 জন তাঁদের বক্তৃতায় সরকারি হুকুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অহিংসা নীতির পূর্ণ সমর্থনে ডাক দিলেন হরতালের। তাঁরা বললেন — ধর্মঘটের মেরুদণ্ড ভাঙার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা সরকার করছেন যেমন করেই হোক তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতেই হবে।

অভূতপূর্ব সাফল্যে সেই হরতাল হল 4 মে। সারা শহর সেদিন যেন প্রাণহীন; সরকারি বে-সরকারি সমস্ত দপ্তর জনশূন্য। যানবাহনের যাতায়াত নেই, ট্রেন বন্ধ, নৌকা জাহাজও নিঃসাড়। বাজার তো বন্ধই এমনকি সাহেবদের বেয়ারা, পাচক, আর্দালিরাও হরতালে যোগ দেওয়ায় বহু বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। প্লেটে খাবারও পড়েনি। এই হরতাল শেষ হল যতীন্দ্রমোহন, মহিমচন্দ্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, কাছেম আলি প্রভৃতি জননেতার নেতৃত্বে এক শোভাযাত্রার পর জনসভায়। যুবাদলের অধিনায়ক ছিলেন চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, অনন্ত সিংহ এবং আরও অনেকে। এইভাবে সরকারের 144 ধারা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হল। গ্রেপ্তার কেউ হননি তবে

নেতাদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট একটি দিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে হাজির হতে। সে হুকুম তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন।

এই হরতাল এবং তার ফলাফল জেলা প্রশাসন এবং বি ও সি-কে বেশ বিব্রত করল। তাঁরা আপস আলাপ-আলোচনা করলেন কি করে এই পরিস্থিতি — যাতে তাঁদের মান মর্যাদা তো গেছেই, ব্যবসাও প্রায় যেতে বসেছে — দুটোই সামলানো যায়। পরদিন সকালে বি ও সি-র এজেন্ট এবং পৌরসভার সভাপতি মার্টিন সাহেব যতীন্দ্রমোহনকে সাদর আহ্বান জানালেন পৌরসভার দপ্তরে ওঁদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসতে। ধর্মঘট এবং হরতালের নেতা হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বৈঠকে বসলেন এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের শর্ত হিসেবে যা কিছু তিনি দিলেন, কোম্পানির কর্তা হিসেবে সাময়িক ভাবে মার্টিন সাহেব সবই মেনে নিলেন। ঠিক হল, চরম সিদ্ধান্ত হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এক বৃহত্তর সভায় — যেখানে সদলে যোগ দিয়ে 'আপস নিষ্পত্তি' আলোচনা হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইতিমধ্যে হরতালের রাত্রেই যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য নেতাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঠিক ছিল সভা হবে কমিশনার সাহেবের দপ্তরে। সদর এস ডি ও, এম সি ঘটক নিজে এসেছিলেন যতীন্দ্রমোহনের বাড়ি এই নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। নিমন্ত্রণ স্বীকৃত হল।

এই বিশেষ সভা ছিল প্রতিনিধিমূলক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আই সি এস, এফ ডব্লু স্ট্রং, বি ও সি এজেন্ট মার্টিন সাহেব, যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য নেতা ছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন চিটাগাং পোর্ট কমিশনার, এ বি রেলের এজেন্ট, স্থানীয় ইউরোপীয় ব্যবসার কিছু কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকজন সরকারি কর্মচারী। মীমাংসা হল যে 144 ধারা অনুযায়ী হরতাল ডাকা নেতাদের আদালতে হাজির হওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয়েছিল তা অবিলম্বে রদ করা হবে। তার প্রত্যুত্তরে বি ও সি শ্রমিক সংঘের কর্মীরা পরদিনই কাজে যোগ দেবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তি বিধান চলবে না। এইভাবে সাফল্যের সঙ্গে দুই পক্ষের আপস নিষ্পত্তি সম্পন্ন হল। প্রথম থেকেই যতীন্দ্রমোহন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপ-আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। যতীন্দ্রমোহনের আইনী বিচক্ষণতা এবং নৈপুণ্য স্ট্রং সাহেবকে মুগ্ধ করেছিল। সভার শেষে বিদায়ের সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যতীন্দ্রমোহনকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানালেন জননেতা হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচক্ষণতার জন্য।

চট্টগ্রামের ঘটনাবলী এবং যতীন্দ্রমোহনের চমকপ্রদ সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় হরফে ছাপা হল কলকাতার দৈনিক পত্রে। জাতীয় পত্রিকাগুলি জানাল আন্তরিক অভিনন্দন। 'দি সারভেন্ট' পত্রিকা বিশেষ এক রচনার শিরোনামা দিল 'ঝাড়ুদারদের রাজা' এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি করল তীব্র সমালোচনা। একটি পত্রিকা লিখল, লোকটি 'চট্টগ্রামের ডেঁপো ছোঁড়া!' 'ঝাড়ুদারদের রাজায়' বলা হল

তিনি (যতীন্দ্রমোহন) নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ মানুষ। কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখেন না। যা হাতে নেন প্রাণ দিয়ে পূর্ণ করেন। নেতৃত্বের সমস্ত গুণ ওঁর মধ্যে বিদ্যমান। উনি নীরব, সরল, স্থির সংকল্পের মানুষ। ওঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প। উনিই মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য শিষ্য। অল্পবয়স্ক হলেও জনতা মনোবৃত্তির ওপর ওঁর পূর্ণ অধিকার। পুলিশ সুপারের আদেশ অমান্য করা ওঁর বে-আইনি মনের পরিচয় নয়, আসলে আইনের প্রকৃত মূল্য বোঝার প্রমাণ। কে বা কার তার হিসাব না রেখে ওঁর অন্তর্নিহিত সঙ্গতি অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

জনতার মন, যা সাধারণত নিয়ম মেনে চলে না তার ওপর ওঁর কর্তৃত্বের মূল কারণ হল তাঁদের প্রতি ওঁর অসীম ভালবাসা। সাধারণ মানুষ তার প্রকৃত বন্ধুকে কখনও ভুল বোঝে না। সেই জন্যই, পরিচয় না থাকলেও বা চোখে না দেখলেও মহাত্মা গান্ধীর নাম মনকে মুগ্ধ করে। যতীন্দ্রমোহনও নিশ্চয় ভালবাসতেন বলেই তাদের পক্ষ সমর্থনের ভার নিয়েছিলেন। তা যদি না হত তাহলে জনতা — তাঁর চলে আসার পরও তাঁর জন্য এমন ভাবে উতলা হত না, যা তারা হচ্ছে। যে মানুষটা অল্প সময়ের সংশ্রবে এমন ভাবে জনতার চিত্ত জয় করতে পারেন তিনি নিশ্চয় তাদের ভাল মন্দকে একাত্ম ভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। উনি সেই প্রকৃতির মানুষ নন যাঁরা উচ্চাশায় জনপ্রিয় আন্দোলনে যোগ দেয় নিজের স্বার্থ সাধনার অসৎ উদ্দেশ্যে। ওঁর সাহস, শক্তি এবং বীরত্ব হল এমন মান এবং মর্যাদার যা প্রকৃত সেবকের মূলমন্ত্র। ওঁর গুণ এবং গৌরবের এই সামান্য স্বীকৃতি দিয়েই আজ বিদায় নেব — এই কথা বলে যে যতীন্দ্রমোহন তাঁর জাতির মান সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

বিদেশী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে প্রাথমিক যে সাফল্য অর্জন করলেন, তারই দ্যুতিতে যতীন্দ্রমোহন এসে দাঁড়ালেন জনজীবনের রাজপথে।

আরও ধর্মঘট

যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের প্রসার আরও কিছু কঠিন ভাবে পরীক্ষিত হল, চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে পর পর নানান ধর্মঘটে যা প্লাবনের মতন এল পূর্ব বাংলা এবং আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

আসামের প্রায় সমস্ত চা বাগানেরই মালিকানা স্বত্ব ছিল বিলাতি ব্যবসাদারদের, আর তাদের ব্যবস্থাপনায় কর্মী আনা হত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, বেছে বেছে গরীব আর বেকার দেখে দেখে নানান রকম সুবিধা, টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে। আসার পর দেখা যেত কাজের শর্তানুযায়ী তারা ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয় — আর্থিক ভাবে নিষ্পেষিত, অমানুষিক ব্যবহারে নির্যাতিত, শারীরিক অত্যাচারে জর্জরিত, গতিবিধির কোনও স্বাধীনতাই তাদের থাকত না, বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথও বন্ধ। এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি প্রচেষ্টা তো দূরের কথা ওদের করুণ কাহিনী শোনে এমন মানুষও কাছে বা দূরে কেউ কোথাও ছিল না।

প্রখ্যাত মানবধর্মী এবং ভারতপ্রেমী সি এফ অ্যানড্রুজ (যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে) চা বাগান শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর, প্রকাশ করেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের

পরবর্তী কালে আসাম চায়ের বাগানগুলো প্রচণ্ড লাভ করলেও শ্রমিকদের তারা মানুষ বলেই গণ্য করত না। তখন দেখা গেল নিম্ন আসামের চারগোলা উপত্যকায় চা-বাগানগুলোয় শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজন অনুপাতে অনেক বেশি। সময়টা তখন 1920 সালের শেষ, 21-এর আরম্ভ। সাহেব কর্মী ছাঁটাই করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদেরও ছাঁটাই করার পর দেখা গেল যারা বাকি আছে তাদের দৈনিক মজুরি চার আনা যার অর্ধেকও তারা নিয়মমত বা সময়মত কখনই পায় না। এই নিয়ে বিক্ষোভের কোন সীমা ছিল না, প্রতিকারও কিছু ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরই কিছু ধর্মঘটী স্বেচ্ছাসেবক কলেজ ছাত্র শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারলেন সহানুভূতিহীন সাহেবদের হাতে চা শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা। বিপদের আভাষ পেয়েই কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস কর্মীদের বাগানে ঢোকা বন্ধ করে দিলেন আর শ্রমিকদের শাসিয়ে দিলেন শাস্তি পাবে যদি তারা মুখ খোলে। উত্যক্ত হয়ে চা শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত করল, বছরের পর বছর কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচার আর সহ্য না করে, সদলে কাজ ছেড়ে আপন আপন গ্রামে ফিরে যাবে। কর্তৃপক্ষ তখন তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের ঋণ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী বাধ্যবাধকতার কথা। কিন্তু সফল হল না কিছুই। হাজার হাজার শ্রমিক বাগান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে আর পায়ে হেঁটেই পৌঁছে গেল করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কিন্তু টিকিট পেল না ট্রেনে চড়ার। বাগানের কর্তৃপক্ষ আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাতে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ শ্রমিকদের টিকিট দেওয়া না হয় এবং ওরা বাগানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

চাঁদপুরের নৃশংসতা

করিমগঞ্জের কংগ্রেস কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনকে আর কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্তকে এবং আবেদন করলেন চলে আসতে। কালবিলম্ব না করে যতীন্দ্রমোহন এলেন এবং প্রকৃত অবস্থার কথা জেনে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করলেন আসাম-বেঙ্গল রেলের এজেন্টের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন আটকে পড়া শ্রমিকদের টিকিট দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে অনেকেই অবশ্য পায়ে হেঁটে চলে এসেছিল চাঁদপুরে আর আশ্রয় নিয়েছিল রেলের সেডে এবং সীমানার মধ্যে। এইভাবে বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক জমা হওয়ায় চাঁদপুরের গতিবিধি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, যার বর্ণনায় সি এফ অ্যানড্রুজ বলেছিলেন, 'চাঁদপুর ঠিক যেন নিম্ন আসামের বন্ধ দরজা।' প্রত্যাগামী শ্রমিকদের যাওয়ার একমাত্র পথ ছাড়াও আসাম-বেঙ্গল রেলের একটা বড় ঘাঁটিই শুধু নয়, চাঁদপুর হল গোয়ালন্দ যাওয়ার পথ এবং কলকাতা আর উত্তর ভারতে যাওয়ার রেল ও স্টীমার পথের মুখ্য কেন্দ্র।

প্রথমাবস্থায় বেশ কয়েক শ' শ্রমিক কলকাতার পথে গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্থানীয় পুলিশ বহু চেষ্টা করেছিল তাদের গতিরোধ করতে কিন্তু কার্যত সফল হয়নি। কর্তৃপক্ষ তখন পূর্ববঙ্গের বিশেষ স্টীমার কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করে জলপথ বন্ধ করে দিলেন জনস্রোত থামানোর জন্য। অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠল যখন শ্রমিকদের এইভাবে দলে দলে চলে যাওয়ার হিড়িক ছড়িয়ে পড়ল আসামের অন্য দুই উপত্যকার চা বাগানগুলিতে। বিচলিত এবং বিব্রত চা বাগানের বড় সাহেবরা ব্যস্ত হয়ে দার্জিলিং গ্রীষ্মাবাসে বাংলা সরকারকে অনুরোধ করলেন প্রকাশ্য ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাঁদের এই বিপদে সাহায্য করতে। গভর্ণরের ওপর চাপ দেওয়া হল — 'শ্রমিকদের চলে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে এই আন্দোলন বন্ধ করুন।' স্থানীয় সরকারী কর্মীরা রেল এবং স্টীমার কোম্পানিকে উদ্ধত কর্তৃত্বপূর্ণ আদেশ দিয়ে শ্রমিকদের আসাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিলেন। 'অবস্থা দেখে আমার মনে হল' দীনবন্ধু সি এফ অ্যানড্রুজ বলেছিলেন — 'বাংলা সরকার শ্রমিকদের পথ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর বলেই চাঁদপুরে ঐ অচল অবস্থা ঘটেছিল।'*

একদিকে নির্যাতন এবং নিষ্পেষণ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার আশায় শ্রমিকদের চলে যাওয়ার এই প্রাণ তুচ্ছ করা প্রয়াস আর অন্য দিকে তাদের পথ বন্ধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের কড়া ব্যবস্থা — এই দুয়ের সংঘাতে অবস্থা দিনে দিনে সঙ্গিন হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ বঞ্চিত অবস্থায় প্রায় চার হাজারেরও বেশি শ্রমিক বিব্রত হয়ে পড়ল প্রয়োজনের তাগিদে আর অন্নের হাহাকারে। তারা আশ্রয় নিল চাঁদপুর রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে।

একদিকে প্রবল বর্ষার আরম্ভ অন্যদিকে পুলিশ আর সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার। ছোট্ট চাঁদপুর শহরটা যেন সৈন্যবাশিবির। মনে হল যেন এই সব নিরাশ্রয়, বিপর্যস্ত অসহায় গরীব শ্রমিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ছোটখাট যুদ্ধে নেমেছে। উদ্ধারের সামান্য ইশারা ছিল চাঁদপুর জনসাধারণের হার্দিক সৌজন্যে আর কংগ্রেসের ঐকান্তিক সাহায্য প্রচেষ্টা। তাঁদের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যতদূর সম্ভব অন্ন-জল সরবরাহ। কিন্তু, কত দিন? যত বাড়ে জটিলতা, তত অরাজকতা।

অচল অবস্থা

এই সঙ্গিন অবস্থায় আগুনে ঘি ঢাললেন কমিশনার সাহেব নিজে উপস্থিত হয়ে। দীনবন্ধুর ভাষায়, "দার্জিলিং থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে উঠে পড়ে লেগে গেলেন চাঁদপুর থেকে স্টীমার যোগে শ্রমিকদের চলে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে। স্টীমারে ওঠার প্রচেষ্টা পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য তিনি স্থির করলেন, রেল

* অপ্রেশন অফ দ্য পুওর : সি. এফ. অ্যানড্রুজ, গণেশ এন্ড কোং, মাদ্রাজ।

প্রাঙ্গন থেকে সরিয়ে তাদের স্টীমার ঘাট থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ফলাফল বিচার না করেই যে জঘন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটা হয়ে উঠল নিষ্ঠুরভাবে পৈশাচিক।''

প্রান্তিক নির্মমতায়, ওদের রেল প্রাঙ্গন থেকে সরাবার আগে মানুষগুলো যে কোথায় যাবে সে কথা তিনি একবার ভাবলেন না। যে ফুটবল মাঠে তাদের জোর করে ঢোকানো হল সঙ্গিনের গুঁতো দিয়ে — তার ওপর কোথাও কোন আচ্ছাদন ছিল না। প্রবল বর্ষায় ভিজে মাঠ জলে ডুবে গেল। আরও অনেক বেশি নিষ্ঠুরতা হয়েছিল তাদের রেল প্রাঙ্গন থেকে বের করার সময়। ইচ্ছাকৃত ভাবে আলো নিভিয়ে, অন্ধকারের আড়ালে গোর্খা সৈন্য ছেড়ে দেওয়া হল ঘুমন্ত অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষগুলোর ওপর। তারা শুধু লাঠি চার্জই করল না, নির্বিচারে বুট পরা পায়ে লাথি মারল, রাইফেলের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারল, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, রোগী কেউ বাদ পড়ল না। 'একেবারে অকারণ' দীনবন্ধু বলেছিলেন, 'পাশবিক অত্যাচার' — রেল প্রাঙ্গন থেকে বের করার জন্য।*

চাঁদপুর পাশবিকতার সংবাদ (20 মে 1921) আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলোর ওপর এই বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' হরতাল পালিত হল। নিন্দা এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠল চাঁদপুরে, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে। নিপীড়িত মানুষদের সাহায্যে স্থানীয় কংগ্রেস, পাড়ায় পাড়ায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে, আর কংগ্রেস নেতা হরদয়াল নাগ টেলিগ্রাম করলেন যতীন্দ্রমোহনকে, চট্টগ্রামে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে পাশে দাঁড়ালেন পক্ককেশ হরিদয়াল নাগের এবং চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করে আনা অর্থ সাহায্য ছাড়াও, স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে আরও টাকা তোলার ব্যবস্থা করলেন। জালিয়াঁওয়ালাবাগের অনুরূপ এই বর্বরতা আরও হীন, ঘৃণ্য এবং পৈশাচিক হল এই কারণে যে এটা ঘটেছিল চাঁদপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনারের নাকের তলায়। তাঁরা দুজনেই ভারতীয় আই সি এস।** বোঝা গেল যে ইতিমধ্যেই তাঁদের যে দুর্নাম ছিল ভারত বিদ্বেষী আর ব্রিটিশের গোলাম বলে, তা একটুও মিথ্যা নয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ভারত-বিদ্বেষী এবং জাতীয়তা বিরোধী দুই 'লৌহ-জাল'-কে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখত। কুমিল্লা কংগ্রেসের নেতা এবং শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের সঙ্গে কমিশনারের এই চাঁদপুর নৃশংসতা নিয়ে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয় যাতে কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর কমিশনার দিতে পারেননি। কলকাতার জাতীয় পত্রিকাগুলি এই ঘটনার প্রচণ্ড নিন্দা করে।

---

* অপ্রেশন অফ দ্য পুওর : সি. এফ. অ্যানড্রুজ, গণেশ এণ্ড কোং, মাদ্রাজ।

** যথাক্রমে এস. কে. সিংহ এবং কে. সি. দে।

চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া

অসহযোগ আন্দোলনের মস্ত ঘাঁটি চট্টগ্রামে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল হয়। চাঁদপুরের সংবাদ সেখানে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই জেলা কংগ্রেসের অধিনায়ক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষকাল আইন আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন (যেখানে কমিশনার নিজে বে-আইনী কাজ করেন সেখানে আইনের আর কতটুকু বাকি থাকে?)। আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত যখন চারিদিকে ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সারা শহরের মানুষ উচ্চকণ্ঠে চাঁদপুর নৃশংসতার নিন্দা করছে। সাড়া পাওয়া গেল তৎক্ষনাৎ। কম করে এক সপ্তাহ কোর্ট-কাছারিতে কোন কাজই হল না। এমনই ক্ষমতা কংগ্রেসের ছিল যে চিঠিপত্র পর্যন্ত বিলি হয়নি। একাধিক দিন শহরের অবস্থা পুরোপুরি অচল ছিল।

অ্যানড্রুজের চট্টগ্রাম সফর

যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল বলেই দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ দুদিনের জন্য চট্টগ্রাম সফরে যান (3, 4 জুন)। শহর ঘুরে তিনি সাহায্যের জন্য অর্থ এবং নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ভিক্ষা করেন। দীনবন্ধু যেখানেই গেছেন সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছেন এবং অকপটভাবে প্রচুর সাহায্য। এক সাধারণ জনসভায় তিনি চাঁদপুর নৃশংসতার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে শ্রমিকদের বেদনাদায়ক দুরবস্থার কথা বলেন আর সমবেত জনতা মুক্ত হস্তে সাধ্যাতীত সাহায্য — অর্থ, অন্ন, বস্ত্র ওঁর হাতে তুলে দেন। বক্তৃতার শেষে দীনবন্ধুর পাঞ্জাবী, কলম এবং গলার মালা নীলাম করে পাওয়া যায় আন্দাজ 1300 টাকা। এর কিছুটা ছিল চাঁদপুরের জন্য বাকিটা আসাম বেঙ্গল রেলের ধর্মঘটের সাহায্যে (সেটা চাঁদপুর নৃশংসতার পরদিনই আরম্ভ হয়ে যায়)।

চট্টগ্রাম পরিভ্রমণের যে বর্ণনা দীনবন্ধু দিয়েছেন তার উল্লেখ করার প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। উনি বলেছেন ঃ

> চাঁদপুর থেকে দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে আমায় এবার আসতে হবে চট্টগ্রামে। ... জাতীয়তার ডাকই হল প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘ জনসভার মূল উৎস। 'বন্দে মাতরম' শুধু পথ পরিক্রমার মূলমন্ত্র নয়, এখানে ওটা প্রাত্যহিক জীবনের প্রেরণা। ... আমি দেখেছি প্লাবনের স্রোতে এসে, এই প্রাণ শক্তি, দীর্ঘ দাসত্বের ফলে মুমূর্ষ মনকে কেমন ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নতুন পবিত্রতায় ...*

দেশবন্ধুর আগমন

পাতিয়া চাঁদপুরে বিশৃঙ্খলা এবং রেল ও স্টীমার কর্মীদের ধর্মঘট সম্পর্কে

---

* অপ্রেশন অফ দ্য পুওর : সি. এফ. অ্যানড্রুজ। এ সময়ে এই গ্রন্থের লেখক চট্টগ্রামে ছিলেন এবং অ্যানড্রুজের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের বিবরণ দেশবন্ধুর মনকে অস্থিরভাবে উদ্বেল করে তুলল। বাসন্তীদেবী এবং অন্যান্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আর সুপ্রভাদেবীকে নিয়ে দেশবন্ধু গোয়ালন্দ যাত্রা করলেন ৫-ই জুন। রিভার স্টীম ন্যাভিগেশান কর্মীরা ধর্মঘটে ব্যস্ত। অতএব জলপথে যাতায়াত বন্ধ। তার ওপর, প্রবল বর্ষা আর প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাষ। প্রবল স্রোতে আর বন্যার সূচনায় পদ্মার রূপও ভয়াবহ। সঙ্গী সাথীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করে দেশবন্ধু স্থির করলেন এই বিপদসঙ্কুল পথেই তিনি পাড়ি দেবেন। নির্যাতিত মানুষদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত ভাবে, যেমন করেই হোক, পরিস্থিতি দেখবেনই। দেশের জনপ্রিয় নেতা এবং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো নৌকা প্রস্তুত। সাধারণ অবস্থায় সাত ঘণ্টার জায়গায় ঐ দুর্গম যাত্রা শেষ হল বাহাত্তর ঘণ্টায়। চাঁদপুরে তাঁর সংবর্ধনা দেশবন্ধুকে সম্মোহিত করে দিল।

ব্রিটিশ ব্যবস্থার এবং শাসনতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চা বাগানের শ্রমিক, রেল ও স্টীমার কর্মীদের ধর্মঘট — একসঙ্গে এই তিনটির সমন্বয়ে সারা দেশ তোলপাড়। অবস্থাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে দেশবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় বললেন :

> আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি বলব, এগুলি কোন ভাবেই শ্রমিক ধর্মঘট নয়। রাজনীতিকও নয়, জাতীয়তার প্রতীক। স্বরাজ পার্টির যে সংগ্রাম ব্যাপ্তভাবে সারা দেশে চলছে, তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত এই তিনটি ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলনের আর এক অংশ।

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যতীন্দ্রমোহনের আত্মিক ঔদার্য, অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রভূত ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতি উপেক্ষা করে এই তিনটি ধর্মঘটের নির্ভীক নেতৃত্বের। দেশবন্ধুর নির্দেশে 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড' থেকে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা হল ধর্মঘটী মানুষদের সাহায্যে। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এই কথা ভেবে যে ধর্মঘটের জন্য নিতান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্বে যতীন্দ্রমোহন যে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন তা পরিশোধ হবে কেমন করে, কিভাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্ব এবং কলকাতার বাড়ি বন্ধক রেখে তিনি স্থানীয় এক ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা।

আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট

চাঁদপুর নৃশংসতার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল আসাম বেঙ্গল রেলের দুই প্রধান ঘাঁটি চাঁদপুর এবং লকসমে রেল কর্মীদের মধ্যে। তাঁরা এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদে পরদিনই আরম্ভ করলেন অতর্কিত ধর্মঘট আর দু-একদিনের মধ্যেই সেটা ছড়িয়ে পড়ল পুরো রেল বিভাগে। চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে আসামের তিনসুকিয়া পর্যন্ত। প্রতিবাদ ছাড়াও তাঁদের কিছু দাবী ছিল, যেমন অন্যান্য রেল

কোম্পানির তুলনায় তাঁদের অত্যন্ত অল্প বেতন। রেলের প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রামে এক সভা করে, তাঁরা ঐ নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করলেন এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ঘোষণা করলেন সাধারণ ধর্মঘট। ঐ সভাতেই রেল শ্রমিক সংঘের সভাপতি করলেন জনপ্রিয় নেতা যতীন্দ্রমোহনকে। এই রেল ধর্মঘট দেখতে দেখতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পৌঁছে গেল রিভার স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ যাতায়াতকারী স্টীমারগুলির সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে। তারাও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিলেন ধর্মঘট। ফলে, দুদিনের মধ্যে সারা দেশে রেল ও জলপথে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

এইভাবে রেল, স্টীমার এবং চা শ্রমিকদের প্রায় 25,000 ধর্মঘটী এবং তাদের পরিবারবর্গের পুরো দায়িত্ব পড়ল যতীন্দ্রমোহনের ওপর। নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই দায় তিনি মেনে নিয়ে আর ঐ জটিল অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্বাধীন করে নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করলেন অসীম দক্ষতায়, তাঁর তীক্ষ্ণ মেধায় এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ততায়।

বর্তমান লেখকের সুযোগ এবং সুবিধা হয়েছিল একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই সব ধর্মঘটের এবং রাজনৈতিক ঘটনার প্রধান ঘাঁটি চট্টগ্রামের, চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ব্যক্তিগত ভাবে উপলব্ধি করার। কলকাতার বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট অজিতকুমার দত্তের, (যিনি তখন যুবনেতা ছিলেন) স্বচক্ষে দেখা বিবরণ উদ্ধৃত করে বলা যায়, "অবস্থা ছিল অবিস্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন নিপীড়িত মানবজাতির মধ্যমণি। চা বাগানের হাজারো শ্রমিক চাঁদপুরে, 150 মাইল ব্যাপী রেল ব্যবস্থার কর্মীদের ধর্মঘট, পথে বসে তাঁদের পরিবারবর্গ আর ওদিকে কাজ বন্ধ করে নদীর কিনারায় স্টীমার কোম্পানির কর্মীবৃন্দ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও বহু জটিল সমস্যা। ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, দিনে কম করে আঠারো ঘণ্টা অবিরাম কাজ করে চলেছেন যতীন্দ্রমোহন। চরকির মতন ঘুরছেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে, স্টেশন থেকে স্টেশনে, মিটিংয়ের পর মিটিং। এই সবের মধ্যে প্রধান ছিল প্রতিটি মানুষকে প্রেরণা দেওয়া আর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল বিমূঢ় মুহূর্তে তাঁর প্রাণখোলা হাসি আর হাস্যরসের প্রাচুর্য।" এ ছাড়াও যতীন্দ্রমোহনের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব এবং ব্যাপ্ত সাফল্যের উল্লেখ এবং লক্ষণীয় গুণাবলীর বর্ণনায় অজিত দত্ত আরও বলেছেন "সারা জীবনের ব্যাপ্তিতে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সহজ, সরল এবং সত্যনিষ্ঠ কর্মসাধক।"*

ভাবতেও অবাক লাগে, ধর্মঘটের সময় কি অদ্ভুত প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ কিছু কর্মঠ যুবককে — যাঁরা চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিয়মিত পায়ে হেঁটে (প্রায় 120 মাইল পথ) চিঠিপত্র আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

---

* অজিতকুমার দত্ত রচিত 'ভাবী-কাল' পত্রিকায় দেশপ্রিয় স্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'যতীন্দ্রমোহনকে আমি যেমন দেখেছি' নিবন্ধ।

ধর্মঘট চলেছিল মাসাধিক কাল। যতীন্দ্রমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল, যাতে ধর্মঘট অহিংস এবং সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ হয় আর হয়েওছিল তাই কিন্তু স্থানীয় শাসকরা চুপ করে থাকার মানুষই নন। তাঁরা 144 ধারা অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর আদেশ জারি করলেন যে মিটিং বা শোভাযাত্রা করা চলবে না। ওদিকে রেল কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম থেকে 5 মাইল দূরে অবস্থিত, পাহাড়তলিতে তাঁদের প্রধান কারখানার কর্মীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করলেন — জিনিসপত্র ফেলে রেখে, সপরিবারে রেল কোয়ার্টার ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে ধর্মঘটী কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হল এক নতুন সমস্যার। সংবাদ পাওয়া মাত্র কংগ্রেস কমিটি সদলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাল পাহাড়তলিতে কর্মীদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করতে। সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত, মহম্মদ হারুণ, প্রেমানন্দ দত্ত, সেরাজুল হক, সামসুদ্দিন সাসারামি, গঙ্গাধর পুংগা, মহম্মদ মুসা, নলিনীরঞ্জন মিত্র প্রমুখ সেচ্ছাসেবকদের প্রথম দল রওনা হল 21 জুন ভোরবেলায়। ওদের রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়েই একদল পুলিশও সেখানে পৌঁছে গেল এক সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে। তারা অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন ঝরঝাইয়া বাট্টালির এক চায়ের দোকানে যেখানে প্রবল বৃষ্টিতে ভেজার পর স্বেচ্ছাসেবকরা সদলে বসে চা খাচ্ছিলেন। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। হাতকড়া পরিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল চট্টগ্রাম থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে, কোটওয়ালিতে।

চট্টগ্রামে পুলিশ ঔদ্ধত্যের সূত্রে এই ন জন স্বেচ্ছাসেবকই হলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম বন্দী। সংবাদ গেল চট্টগ্রামে, কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্রে। যতীন্দ্রমোহন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শের পর ঠিক হল আইনসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ কার্যে নিরত স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদে বেশ বড় ধরণের এক শোভাযাত্রা বের করা হবে। তাঁরা বেশ ভাল করেই জানতেন যে এটা হবে 144 ধারা অনুযায়ী সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা। সবাইকে তাই যতীন্দ্রমোহন সাবধান করে দিলেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকতে এবং পুলিশ অথবা শোভাযাত্রায় সহযোগিতার মুখোস পরা কোন মানুষের প্ররোচনায় তাঁরা যেন কোন ভাবেই উত্তেজিত না হন। সকলেই সমবেত ভাবে শান্তির প্রতিশ্রুতি স্বীকার করে নিলেন। ঠিক হল শোভাযাত্রা সমগ্র শহর পরিক্রমা করবে এবং পথে বিভিন্ন ধর্ম মন্দিরে প্রার্থনা জানানো হবে।

শোভাযাত্রা শুরু হল অসীম উৎসাহে। যত এগিয়ে চলল শয়ে শয়ে মানুষ যোগ দিল। পথে হিন্দু মন্দির এবং শিখ গুরুদ্বারে প্রার্থনা সেরে শোভাযাত্রা যাচ্ছিল শহরের মাঝখানে আনেরকিল্লা মসজিদের দিকে। সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেট স্ট্রং এবং পুলিশ সাহেব কর্জিস ব্যক্তিগত ভাবে এসে বাধা দিলেন শোভাযাত্রাকে। হুকুম দিলেন

সবাইকে চলে যেতে। কেউ এক পা নড়ল না। কিছু তর্ক-বিতর্কের পর গ্রেপ্তার করা হল যতীন্দ্রমোহন, মহিমচন্দ্র দাস এবং আরও দশ বারো জনকে। বৃষ্টি তখন প্রবল ধারে। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে শোভাযাত্রা আবার চলল পূর্ণোদ্যমে 'বন্দে মাতারম' 'আল্লা হো আকবর' 'মহাত্মা গান্ধীর জয়' আর 'যতীন্দ্রমোহনের জয়' ইত্যাদি শ্লোগানে শহর মুখরিত করে। পুলিশের লাঠিতে অনেকেই আহত হলেন।

গ্রেপ্তারের পর নেতাদের নিয়ে যাওয়া হল জেলখানায়। সারা রাত তাঁদের সেইখানে রাখা হল। যতীন্দ্রমোহনকে জামিনে খালাসের প্রস্তাব দেওয়া হল, তিনি নিলেন না। ওদিকে, জেলগেটের সামনে লোকে লোকারণ্য, ঘন ঘন শ্লোগান দিচ্ছে। উত্তেজনা তাঁদের এত বেশি যে পুলিশ বাধ্য হল যতীন্দ্রমোহনকে বাইরে আনতে। একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি করজোড়ে জনতাকে নিবেদন করলেন শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত থাকতে। কিছুকাল পরে আরও বড় জনতা জড়ো হল আদালত প্রাঙ্গনে যেখানে ওঁদের বিচার হওয়ার কথা। সেদিন ছিল শনিবার। ওঁকে ব্যক্তিগত জামিন দেওয়ার প্রস্তাব দিল পুলিশ। উনি আবার সেটা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। বিচার মুলতুবি রইল সোমবার পর্যন্ত (4 জুলাই)।

নেতা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা শহর অচল হল 'হরতালে'। শহর আর শহরতলি গভীর উত্তেজনায় অধীর। হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল 'কোর্ট হিলে' এবং সমবেত ভাবে দাবি জানাল নেতাদের মুক্তি। আদালতও লোকে লোকারণ্য। পুলিশ তাদের সামলাতে না পারায় শুনানীও মাঝে মাঝেই বাধা পেল, সারাদিন।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের এই সব ঘটনার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হল কলকাতায়। উপযুক্ত শিষ্য যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হলেন গর্বিত কিন্তু ভয়ও পেলেন, পাছে তাঁর অনুপস্থিতিতে জনতা অধৈর্য হয়ে হিংসাত্মক কাজে মেতে ওঠে। উনি নেলী সেনগুপ্তাকে তারবার্তায় অনুরোধ জানালেন যতীন্দ্রমোহন যেন জামিন নিয়ে, জনতাকে শান্ত রেখে গঠনমূলক পথে চালনার চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়ে যতীন্দ্রমোহন তিন মাস শান্তিপূর্ণভাবে থাকার শর্তে ব্যক্তিগত জামিনে খালাস হলেন — প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। বাইরে আসতেই পেলেন বিপুল সংবর্ধনা। ইতিমধ্যেই যোগ্য স্বামীর যোগ্য স্ত্রীর আসনে অভিষিক্ত নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে হল এক বিরাট জনসভা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মূল মন্ত্র অহিংসা নীতি অবলম্বনের সকাতর অনুরোধ জানিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত এক ভাষণ দিলেন। সভা হাজার টাকার প্রণামী দিল যতীন্দ্রমোহনকে ধর্মঘটীদের সাহায্যে।

এই সময় সেনগুপ্ত দম্পতি, রেলপথ বন্ধ থাকায় 'সাজাহাঁ' নামীয় স্টীমারে কলকাতা গেলেন কয়েকদিনের জন্য (1 আগস্ট)। চাঁদপাল ঘাটে স্টীমার ভিড়তেই সমবেত বিপুল জনতার কাছে পেলেন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা। অসহযোগ আন্দোলন

সাফল্যমণ্ডিত করায় ওঁর সাধনা এবং চট্টগ্রামে তার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ বড় বড় হরফে প্রকাশিত হল প্রতিটি জাতীয় পত্রিকায়। তাঁদের আসার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটীদের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ এবং সেই অবসরে দেশবন্ধু এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অনুমতি না নিয়েই 144 ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য সমিতি ওঁর কাছে জবাবদিহি চাইলেন। বস্তুত সমগ্র ভারতে প্রথম সত্যাগ্রহ উনিই করেছিলেন চট্টগ্রামে সাময়িক পরিস্থিতির জের সামলাতে আর এ বিষয় ওঁর সঙ্গী সাথীদের ছিল সম্পূর্ণ সমর্থন। সাধারণ জনতার উৎসাহ কখনও উনি স্তিমিত হতে দেননি। তাছাড়া, কথায় এবং কাজে অহিংসা নীতির সব সূত্র ওঁরা সর্বতোভাবে স্বীকার এবং সম্মান করেছেন। ওঁর সানন্দ সমর্থনে দেশবন্ধু কংগ্রেসীয় বড়কর্তাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর কার্যকারিতায় শুধু অসহযোগ আন্দোলনকেই নয়, বিরাট জাতীয় ধর্মঘটকেও যৌক্তিকভাবে যতীন্দ্রমোহন সাহায্য ও সার্থক করেছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত সত্যাগ্রহ করে সাধারণ মানুষ প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে তাঁরা স্বৈরতন্ত্রী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। আর, তাঁদের স্বীকৃত নেতা হিসেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহন ঠিক কাজই করেছেন।

ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময়ই মৌলানা মহম্মদ আলির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল এবং অগ্রগতি যাচাই করতে। তাঁদের ভ্রমণ তালিকায় বাংলাই ছিল প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র কারণ এইখানেই অসহযোগ আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থত্যাগ সবার ওপরে এবং শাসকদের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গিন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় সবই শূন্য এবং গঠনমূলক ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিদেশী বর্জনের আগুন জ্বলছে চারিদিকে আর খাদি এবং চরকার প্রচলন প্রায় ঘরে ঘরে। বাংলার সব জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম ছিল ওঁদের ভ্রমণ তালিকায় 'এক নম্বরে।'

চট্টগ্রামে গান্ধীজী

মহাত্মাজী, মৌলানা এবং অন্যান্য অনেকে পৌছালেন 31 আগস্ট। সেনগুপ্ত ভবনে ক্ষণিক বিশ্রাম এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির ইতিবৃত্ত শোনার পর দেশপ্রিয়র সঙ্গে মহাত্মাজী এবং মৌলানা গেলেন সভা ময়দানে (যেটা বর্তমানে গান্ধী মেমোরিয়াল নামে অভিহিত)। ময়দান ইতিমধ্যেই জন-সমুদ্র। সমবেত জনতার হার্দিক অভ্যর্থনায় অভিভূত হয়ে গান্ধীজী এবং মৌলানা, তাঁদের বক্তৃতায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামবাসীদের অদম্য উৎসাহ আর তাঁদের নেতা যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য কংগ্রেসকর্মীদের সুচারু ব্যবস্থাপনার প্রভুত প্রশংসা করে চট্টগ্রামকে জানালেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন। প্রকাশ্য ভাবে, ভারতের বিভিন্ন অংশকে তাঁরা আবেদন

জানালেন — দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের এই ছোট্ট শহর — যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাফল্যের শীর্ষে তুলে ধরেছে — তাঁদের অনন্য উদাহরণ অনুসরণ করতে। চট্টগ্রামের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে উনি ফিরে গিয়েই ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় পঞ্চমুখী দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, 'সবার আগে চট্টগ্রাম' আর 'চট্টগ্রামের রানী' এই শিরোনামায়। প্রায় রাতারাতি, ভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিকায় চট্টগ্রাম উঠে গেল সমগ্র ভারতের শীর্ষদেশে এবং যতীন্দ্রমোহন স্বীকৃত হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বভারতীয় সেরা নেতাদের অন্যতম হিসেবে।

রেল ধর্মঘট তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এল এক সংকটময় মুহূর্ত। একদিকে প্রায় 15,000 কর্মী নিঃস্বতায় পৌঁছে গেছে তাঁদের শক্তির শেষ সীমান্তে আর অন্যদিকে প্রলম্বিত ধর্মঘটে পর্যুদস্ত রেল কোম্পানি নতুন কর্মী নিয়োগে ব্যস্ত। ধর্মঘটীরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নৈতিক ভাবে অবনত। এত লোকের জন্য অন্য চাকরির ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। কাজেই সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী, যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য নেতারা এই একটানা ধর্মঘটের ফলে কর্মীদের জটিল ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। যাঁরা কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁদের অনুমতি দেওয়া হল। ধর্মঘটী নেতাদের অবশ্য চাকরিতে নেওয়া তো হলই না, তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি থেকেও বঞ্চিত করা হল। এঁদের মধ্যে কিছু নামলেন ব্যবসায় আর কিছু লেগে গেলেন গঠনমূলক জাতীয় কাজে। এই প্রসঙ্গে দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য : বিপিন বিহারী ঘোষ (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত গণেশ ঘোষের পিতা) যিনি পরে একজন জাতীয় নেতা হয়েছিলেন এবং ক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি দেশপ্রিয়র ব্যক্তিগত সহকারী হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে ছিলেন।

প্রথম শাস্তি

জামিনের তিন মাস উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (24 সেপ্টেম্বর 1921) দেশপ্রিয়কে আবার গ্রেপ্তার করা হল এক অদ্ভুত কারণে : পাহাড়তলি সংঘর্ষে সামিল ছিলেন এই অজুহাতে। জামিন নিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ওঁকে আটক রাখা হল। অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। কাজেই, প্রথম বিচারে (4 অক্টোবর) উনি এবং অন্যান্যরা বেকসুর খালাস পেলেন। তারপরই আবার নিতান্ত অকারণেই ওঁদের বিচার এবং শাস্তি হল (20 অক্টোবর) 144 ধারা অগ্রাহ্য করে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করার কারণ দেখিয়ে। ওঁর শাস্তি হল তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। অসহযোগ আন্দোলনে এটাই ওঁর প্রথম কারাবাস। সেই বিকেলেই যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্যদের নিয়ে যাওয়া হল কলকাতার আলিপুর জেলে। এই শাস্তি বিধানের এবং তার চেয়ে বেশি জেলার বাইরে ওঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্য জনতা হল উত্তেজিত। সদলে তারা শোভাযাত্রা করে গেল স্টেশনে — নেতাকে দর্শন এবং সশ্রদ্ধ বিদায় সংবর্ধনা জানাতে।

শোভাযাত্রা গেল গভীর উত্তেজনায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে এবং শ্লোগান দিতে দিতে। পরে জানা গিয়েছিল, গোপন ব্যবস্থা ছিল, পথে যে কোন এক অজুহাতে জনতাকে আক্রমণ করে অসহযোগ আন্দোলনকে বিরাট এক আঘাত হানা, শোভাযাত্রা ঠিক যখন স্টেশনে ঢুকবে, আগে থেকেই মোতায়েন গোর্খা সৈন্য এগিয়ে এল জনতাকে আক্রমণ করতে। এই সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ প্রসন্নকুমার সেন পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজীকে। যেটা ছাপা হয়েছিল 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার 1921 সালের 3 নভেম্বর সংখ্যায়।

> সম্পূর্ণভাবে অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোর্খা সৈন্যরা শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করে। শাসকরা নিজেদের অপরাধ খণ্ডন করার চেষ্টায় এই মিথ্যা অজুহাত দেখায় যে 20 তারিখের শোভাযাত্রায় জনতা নাকি 144 ধারা অনুযায়ী জনপথে শোভাযাত্রা না করার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং হিংসাত্মক আক্রমণে পাথর ছুঁড়েছিল পুলিশের ওপর।

যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ-এ-চাঁগো, অশীতিপর মুসলিম নেতা মৌলবী কাশেম আলি, কালীশংকর চক্রবর্তী, 'জ্যোতি' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক সুখেন্দু সেনগুপ্ত, সেরাজুল হক এবং জনপ্রিয় কংগ্রেস কর্মী প্রেমানন্দ দত্ত। পরে প্রেমানন্দ দত্ত সেখানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন না, প্রমাণিত হওয়ায় ওঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। অন্যান্যদের বিচার হয়, হাঙ্গামা করা, পুলিশের হাত থেকে নেতাদের উদ্ধার করার অবৈধ প্রচেষ্টা ইত্যাদি নানান অভিযোগে। প্রায় ছ'মাস মামলা চলার পর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। যাঁরা সব ব্যাপারটা জানেন তাঁরা প্রখ্যাত জননেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য আর অলীক প্রমাণের প্রহসন দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ভারতের অন্যান্য কেন্দ্র এমন কি কলকাতার তুলনায়ও অসহযোগ আন্দোলন এবং সাধারণ জনতার ওপর তার প্রভাব চট্টগ্রামেই হয় সবার আগে সকলের চেয়ে বেশি। যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য নেতারা 144 ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারাবরণ করেন 1921 সালের মাঝামাঝি। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার নেতৃত্বে মহিলারাও আন্দোলনে যোগ দেন কলকাতার বহু আগে — 1921 সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারতে আসেন এবং তার প্রতিবাদে সারা দেশব্যপী হয় ব্যাপক হরতাল, বিদেশী পোশাক বর্জন এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা। কলকাতায় বাসন্তীদেবীর সঙ্গে অন্যান্য মহিলা এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্যেরা গ্রেপ্তার হন ঐ বছরের শেষে। জাতীয় বক্তা হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে নেলী সেনগুপ্তা পরিচিত হন 21 জুলাই 1921 যখন যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্যাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

যতীন্দ্রমোহন গ্রেপ্তার হওয়ার পর সংগ্রামের ক্ষেত্রে আসেন স্থানীয় নেতারা। নেলী সেনগুপ্তা আন্দোলনের হাল ধরেন উৎসাহী বহু মহিলাদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে

ছিলেন কুসুমকুমারী সেনগুপ্তা এবং স্বর্ণলতাদেবী। এঁরা করেন খাদি এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজের প্রচার। অল্পদিনের মধ্যে নেলী সেনগুপ্তার ওপরও 144 ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ চালিয়ে যান। 'যানবাহনের গতিবিধি রোধ', 'জনসাধারণের অসুবিধা' ইত্যাদি বহু অমূলক অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বেশ কড়া ভাষায় চিঠি দেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সে চিঠি বেমালুম হজম করেন।

এর অল্পকাল পরেই বঙ্গীয় সরকার সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করে। তারপরই, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রতাপচন্দ্র গুহ আসেন চট্টগ্রামে এবং যাত্রামোহন সেন হলে অনুষ্ঠিত (18 ডিসেম্বর 1921) এক সাধারণ সভায় 1000 স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন, যাঁরা পরদিন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। পরে বহু ব্যক্তি তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করেন।

যতীন্দ্রমোহন ছাড়াও আরও বহু নেতা স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন চট্টগ্রাম আন্দোলনে যাঁদের ত্যাগ এবং নিষ্ঠা সমান স্মরণীয়। তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন এবং প্রগাঢ় দেশভক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন (যতটা স্মরণ আছে) মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ-এ-চাঁটগাও কাসেম আলি, কৃপালদাস উদাসী, স্বামী দীনবান্দা, মৌলবী আবদুল করিম, শাহ বিদাউল আলম, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি, কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র গুহ, প্রসন্নকুমার সেন, যামিনীমোহন বসু, রমেশচন্দ্র রক্ষিত, বত্নেশ্বর চক্রবর্তী, বরদাপ্রসাদ নন্দী, দ্বিজেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, মোক্ষদারঞ্জন কানুনগো এবং রমনীরঞ্জন গুপ্ত। এছাড়াও আন্দাজ 6000 স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন শত শত কলেজের ছাত্র, যাঁরা আন্দোলনে যোগদান করে গ্রেপ্তার হন, কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং পুলিশ ও সৈন্যদের বহুবিধ অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হন।

নোয়াখালি এবং ফরিদপুর থেকে যে সব নেতা চট্টগ্রামে এসে জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। প্রতাপবাবু কলকাতাতেও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভাপতি হন।

যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা পুরোপুরি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হল ন্যাশানাল হাই স্কুল, জে এম সেন হাই স্কুল, ওরিয়েন্টাল আকাদেমি, ম্যুনিসিপাল হাই স্কুল ইত্যাদি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল চট্টগ্রামের অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমাবস্থায়, জাতীয়তা জাগরণের

উদ্দেশ্যে বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব করেছিলেন। তার আভাষ তিনি দিয়েছিলেন (বাসন্তীদেবীর সভাপতিত্বে) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির ভাষণে। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের 50,000 টাকার মধ্যে চট্টগ্রাম দিয়েছিল 29,000 এবং ধর্মঘটী কর্মীদের সাহায্যে দিয়েছিল 50,000 টাকারও বেশি। এছাড়াও, বিভিন্ন গ্রামীন কেন্দ্রে চরকা কাটা এবং খাদির কাপড় বোনার সুখ সুবিধাও যথেষ্টই করে দিয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল প্রায় 20,000 চরকা আর 16,000 তাঁতের। এই ব্যাপারে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে জরারগঞ্জ, সুচিয়া, সাতবারিয়া, সাতকনিয়া আর দুর্গাপুর কেন্দ্রে কাজ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। সুচিয়া কেন্দ্রের হাতে বোনা খাদি কলকাতার খাদি প্রতিষ্ঠানে এমন প্রসিদ্ধ হয়েছিল যে তাঁরা চট্টগ্রামের গ্রামীন কেন্দ্রে নিজেদের তাঁত বসিয়েছিল। এই সব নানান কারণে চট্টগ্রাম ছিল সবার আগে আর জাতি, ধর্ম, বয়স নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ যতীন্দ্রমোহনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল 'দেশপ্রিয়'।

দ্বিতীয় সংগ্রাম ক্ষেত্রের সূচনা : কেন্দ্র চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম কন্‌ফারেন্সে আভাষ পাওয়া গেল রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমাসন্ন কিছু পরিবর্তনের। বস্তুত আলিপুর জেলে কারারুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও (ফেব্রুয়ারী - আগস্ট 1922) চিত্তরঞ্জন যা চিন্তা করেছিলেন তারই কিছু প্রতিধ্বনি শোনা গেল ঐ কনফারেন্সে। তারও আগে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর 1920) গান্ধীজী যখন আন্দোলনের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনই চিত্তরঞ্জনের পরিকল্পনা ছিল কাউন্সিলে যোগ দেওয়া।

আবেগপ্রবণ দেশভক্ত চিত্তরঞ্জনের প্রান্তিক প্রচেষ্টা ছিল, বার্দোলোই অপসারণের ফলে অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল এবং যে কারণে ওগুলো বন্ধ করতে হল আর গান্ধীজী ছ'বছরের জন্য জেলে গেলেন - তার থেকে পুনরুদ্ধার করে দেশকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

কলকাতা মূল কেন্দ্র হলেও, এ দাবী হয়তো ভুল হবে না চট্টগ্রামই সর্বপ্রথম সেই সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে, পতাকা তুলে ধরেছিল, যে সংগ্রাম, গান্ধীজীর প্রধান অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও, ভয় ভাবনা ভুলে, সার্থক অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে প্রথম শুরু করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। পরে অবশ্যই কংগ্রেস তা স্বীকার করে নিজেদের নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করেছিল।

চিত্তরঞ্জনের চিন্তানুযায়ী পরিবর্তনের ফলে ওঁর সঙ্গে মোতিলাল নেহরু, আজমল খাঁ, ডবুউ সি কেলকর, বিটলভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন নেতা স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালালেন প্রায় চার বছর (1923-27) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিধানসভায় যোগদান করে, এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রই হল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র।

বার্দোলোই সিদ্ধান্তের পর, প্রায় সমস্ত নেতা জেলে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি বেশ কিছুটা ম্লান এবং মুমূর্ষ হয়ে পড়ে এবং জাতীয় আন্দোলন প্রায় থেমে যায় বললেই চলে। যতীন্দ্রমোহন সবে তখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন (জানুয়ারী, 1922)- কিন্তু সমস্ত বাংলার নেতা হিসেবে গুরুদায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে বয়সে নিতান্ত নবীন। ঠিক হল বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক সভায় বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কেউ একজন প্রস্তাব করলেন যে প্রাদেশিক কনফারেন্সের একটা অধিবেশন ডাকা হোক কিন্তু কয়েকজন তাতে আপত্তি জানালেন। বিভিন্ন জেলার নেতারা উদাসীন। তখন যতীন্দ্রমোহন এগিয়ে এসে প্রস্তাব করলেন অধিবেশনটা তাঁর অঞ্চল — অর্থাৎ চট্টগ্রামেই হোক।

যতীন্দ্রমোহনেরই প্রস্তাবানুযায়ী সকলেরই পূর্ণ সমর্থনে বাসন্তীদেবী মনোনীত হলেন এই বিশেষ অধিবেশনের সভানেত্রী। আর একটা দিক ছিল কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে যতীন্দ্রমোহনের অন্তর্ভুক্তি (জানুয়ারী 1922)।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কনফারেন্সের এই উন্মুক্ত অধিবেশনে বাসন্তীদেবীর সভানেত্রী হওয়ার সংবাদে চিত্তরঞ্জন খুশি হলেন। তাঁর ভাষণে, চিত্তরঞ্জনের সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে বাসন্তীদেবী জানালেন যে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করে যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যরা যখন অনিশ্চিত, উনিই ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম, যাঁরা বিধানসভায় যোগদান প্রসঙ্গে বাসন্তীদেবীর উক্তি সর্বতোভাবে সমর্থন করেন। বলা যায়, কাজটা মহৎ গুরুর উপযুক্ত শিষ্যেরই অনুরূপ।

এই অধিবেশনের সময় জেলা প্রশাসন কর্তৃক ব্রিটিশ ষাঁড়ের বিপদ চিহ্ন 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে একটা অঘটন ঘটে। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যমফিল্ড ফুলারের আমল থেকে এবং বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলন আর বরিশালে কনফারেন্সের সময় (1905-1906) 'বন্দে মাতরম' নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বেশ বড় ধরণের চাঞ্চল্য হয়েছিল। যে কারণে জেলা কালেক্টরের নির্ভীক বিরোধিতা করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্ত হন এবং বেশ বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয় আর পুলিশের আক্রমণে বরিশাল অধিবেশনও বন্ধ হয়ে যায়। বরিশালের এই ঘটনা এবং অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্কটময় অবস্থায় চট্টগ্রামে যা ঘটেছিল সে বিষয় যতীন্দ্রমোহন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি চাননি যে আবার বরিশালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক — আর সাময়িক পরিস্থিতির কথা ভেবে, প্রভূত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উনি নিষেধাজ্ঞা অমান্য না করাই স্থির করেন। সমাগত বহু প্রতিনিধিই এ বিষয় অন্য মত। ব্যাপারটা তাঁদের বুঝিয়ে সিদ্ধান্তের সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিলেন। নির্বাচিত সভানেত্রী বাসন্তীদেবী এবং অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের অনেকেই কলকাতা থেকে এলেন একই স্টীমারে। আসাম বেঙ্গল রেলের ধর্মঘট তখনও চলছে আর ষ্টীমারে সকলেই 'বন্দে মাতরম' নিষেধাজ্ঞার কথা শুনে

ইতিমধ্যেই উত্তেজিত। যতীন্দ্রমোহন এবং অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সদস্যরা স্টীমারে গেলেন তাঁদের স্বাগত জানাতে। ব্যাপারটা তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে বলায় বাসন্তীদেবী একমত হলেন আর উত্তেজিত প্রতিনিধিরা শান্ত হলেন।

তিন

কর্মজীবনের শীর্ষ

স্বরাজ - সম্রাট

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে স্বরাজ্য পার্টির জন্ম। দেশবন্ধু এবং মোতিলাল নেহরু তখন ছিলেন সর্বময় নেতা। বাংলায় দেশবন্ধু ছিলেন সভাপতি আর যতীন্দ্রমোহন সাধারণ সম্পাদক। যতীন্দ্রমোহন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং কলকাতা কংগ্রেস ম্যুনিসিপ্যাল অ্যাসোশিয়েশনেরও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দেশবন্ধুই প্রথম স্বরাজ্যীয় মেয়র নির্বাচিত হন।

দেশবন্ধুর অনুরোধে মাত্র তিন মাসের জন্য ওকালতি বন্ধ রাখলেও (1921) যতীন্দ্রমোহন আবার ওকালতি আরম্ভ করলেন তিন বছর পর। এই তিন বছর সব কাজ বন্ধ করে অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধনায় লিপ্ত থাকায় ঋণের বোঝা এবং আর্থিক অভাব অনটনে তিনি বিপর্যস্ত হন। কাজ তাই শুরু করতেই হল। এই নিয়ে কলকাতা এবং চট্টগ্রামে যথেষ্ট আলোচনা হয় এবং চিত্তরঞ্জন দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু ব্যাপারটা তিনি বুঝেই বলেছিলেন, "নিতান্ত প্রয়োজনেই যতীনকে কাজে ফিরে যেতেই হল।" যতীন্দ্রমোহন কিন্তু সকলের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন। কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর জাতীয় সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে। তাঁর কর্মধারা, বোধ শক্তি এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় দেশবন্ধুর আরও অনেক কাছে সরে এলেন তাঁর সমস্ত বড় কাজের জের টেনে। যখনই অসুস্থ হয়ে অথবা বিশ্রামের প্রয়োজনে দেশবন্ধু পাটনা যেতেন, স্বরাজ্য পার্টির সমস্ত দায়িত্ব পড়ত যতীন্দ্রমোহনের কাঁধে।

বাংলাদেশের স্বরাজ্য পার্টির বিশেষ দায়িত্ব ছিল বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে (নভেম্বর 1923)। দেশবন্ধুর যাদুকরী হাতের ছোঁয়ায় স্বরাজ্য প্রার্থীরা চমকপ্রদ ভাবে

জিতেছিলেন। এমন কি নিতান্ত নতুন, অনভিজ্ঞ এবং অজানা প্রার্থীরাও অনায়াসে নির্বাচিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস আর দাস, এস এন মল্লিক প্রমুখ বড় বড় নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। নতুন বিধানসভায় 40 জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিই ছিল বৃহত্তম দল। দলের মান আরও বৃদ্ধি পেল যখন সভায় ন্যাশানাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে, চিত্তরঞ্জন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত হিন্দু-মুসলমান চুক্তি করলেন। 1924 সালের মার্চ মাসে, বিধানসভার সংখ্যাগুরু সভ্য নিয়ে, যতীন্দ্রমোহন আরম্ভ করলেন দ্বৈত-শাসনের বিরুদ্ধে অভিযান। বাংলার গভর্নর লর্ড লীটন, সাংবিধানিক বিচক্ষণতা দেখিয়ে চিত্তরঞ্জনকে আমন্ত্রণ জানালেন 'হস্তান্তরিত' কিছু বিভাগের কর্মভার গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রিসভা স্থির করতে। কিন্তু প্রস্তাবটি পার্টির মুখ্য আদর্শ 'দ্বৈত-শাসনের অবসান' — এই নীতির প্রতিরূপ বলে চিত্তরঞ্জন রাজি হলেন না।

মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত প্রস্তাব বাতিল করাই চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টির প্রথম সাফল্য। তিন মাস পর ঐ প্রস্তাব আবার বাতিল হল 'এমন এক সময় যখন স্বরাজ্য পার্টির খুবই প্রয়োজন ছিল তাঁদের প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা বাড়ানো।''*

পরে আরও একবার ঐ প্রস্তাব বাতিল হয় এবং মন্ত্রীবর্গ পদত্যাগ করেন।

দ্বৈত-শাসনের এই পরিসমাপ্তিতে বঙ্গীয় সরকার অসাধারণ এক অর্ডিন্যান্স জারি করে চেষ্টা করলেন তাড়াহুড়ো করে, সভার মাধ্যমে 'অর্ডিন্যান্স বিল' (যা রাওল্যাট অ্যাক্টের অনুরূপ) কোন রকমে পাস করিয়ে নিতে। ঐ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সুভাষ বসু, অনিলবরণ রায় এবং সত্যেন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করার ফলে, সভায় স্বরাজ্য পার্টির সভ্য সংখ্যা কিছু কম ছিল। এই চরম সঙ্কটপূর্ণ সময়ে চিত্তরঞ্জন কলকাতায় ফিরে এলেন ঐ জঘন্য অর্ডিন্যান্স বিল — যাকে তিনি বলতেন 'ব্ল্যাক বিল' — প্রতিরোধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চিত্তরঞ্জন স্ট্রেচারে করে এলেন বিধানসভায় আর তাই দেখে অ-স্বরাজ্য পার্টির সভ্যরাও এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে ঐ বিলের প্রস্তাব, বলতে গেলে, ধুয়ে মুছে গেল।

লর্ড লীটন তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলটি পাস করিয়ে আইনে প্রবর্তিত করলেন। ব্যাপার দেখে সবাই হেসেই খুন। 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার বুঝিয়ে দিলেন যে প্রতিনিধিমূলক সরকারের কোন সার্থকতাই নেই।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর (1925) যতীন্দ্রমোহন হলেন বিধানসভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতা এবং নলিনীরঞ্জন সরকার হলেন সাধারণ সম্পাদক।

নভেম্বর অধিবেশনে (1925) স্বরাজ্য পার্টি বেশ কিছু সাফল্য পেলেন বেঙ্গল ম্যুনিসিপ্যালিটি বিল প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু প্রস্তাব অতিরিক্ত সংখ্যাগুরুত্বে পাস করিয়ে। তাছাড়াও, অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে 'নিন্দা' প্রস্তাব পাস

* রাসব্রুক উইলিয়ামস — ইন্ডিয়া ইন 1924-25।

করলেন বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করার কারণে। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বেশ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিধানসভায়। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি অনিবার্য।

> এই প্রস্তাব আমরা করছি কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। এটা অমানুষিক অত্যাচারের আর্তনাদ, মানবীয়তার মর্মান্তিক হাহাকার। আমরা প্রস্তাব এনেছি কারণ আমরা জানি বন্দীদের উপযুক্ত বস্ত্র না দিয়েই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় প্রচণ্ড শীতের রাত্রে। কাজেই আমি অভিযোগ করছি যে সরকার এইসব বন্দীদের প্রতি বর্বর অত্যাচার করার অপরাধে অপরাধী। আমি আরও অভিযোগ করছি যে সরকারের প্রশাসন যন্ত্র বিকৃত ভাবে অ্যাক্ট প্রয়োগ করছেন এবং বিনা বিচারে নিরপরাধ মানুষদের বন্দী রেখে পাশবিক অত্যাচার করছেন।

স্বরাজ্য পার্টির প্রস্তাব 60 ভোটের বিপক্ষে 58 ভোটে পাস হয় তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। যতীন্দ্রমোহনের নায়কত্বে স্বরাজ্য পার্টির এ এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা।

অন্যান্য প্রদেশের মতন বাংলাদেশেও আবার নির্বাচন হয় 1926 সালে। আর তাঁর সাফল্যমণ্ডিত নায়কত্বের কারণে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও যতীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণ আসে নির্বাচনী প্রচার কার্যে সাহায্য করতে। বাংলাদেশে কিছু অভ্যন্তরীণ দলাদলি সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন অনেক ভোটে জেতেন এবং ঠিক আগেকার মতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হলেও, পার্টির সংখ্যাগুরুত্ব বজায় থাকে। এ ছাড়াও, স্বরাজ্য পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে যতীন্দ্রমোহন দ্বিতীয়বার কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঠিক এই সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে যেটা আয়ত্তে আনা হয়। মেয়র যতীন্দ্রমোহনের নায়কত্বে কিছু ছাত্র গোষ্ঠী এবং কর্পোরেশনের কিছু কাউন্সিলারদের সমবেত প্রচেষ্টায়। এই দাঙ্গার কারণে কিছু স্বরাজ্য মুসলমান সভ্য উদাসীন হয়ে পড়েন। ওদিকে, স্বরাজ্য পার্টির শক্তি হ্রাসের সুযোগ নিয়ে সরকার আবার দ্বৈত-শাসন শুরু করে দেয়।

এই দ্বৈত-শাসন প্রবর্তনের তীব্র প্রতিবাদে স্বরাজ্য পার্টির নেতা যতীন্দ্রমোহন সভায় বেশ কড়া ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সামান্য কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল।

> যে দ্বৈত-শাসন তিন বছর আগে আমরা মুছে দিয়েছিলাম, সরকার চাইছেন আবার সেটা চালু করতে। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে আজ আমরা হারতেও পারি, জিততেও পারি। ফলাফল যাই হোক, এই সভার সভ্যদের এবং বাইরের সাধারণ মানুষদের আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি যে সরকার মন্ত্রী পেলেও আমাদের মহান নেতা চিত্তরঞ্জনের আদর্শে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিরোধের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার কোন কিছুই কোন দিনও ব্যর্থ হবে না, বন্ধ হবে না। দ্বৈত-শাসনের কাঠামো হয়তো হবে কিন্তু মোটা মাইনের বিনিময়ে নিযুক্ত দুজন মন্ত্রী সত্ত্বেও তা হবে অন্তঃসারশূন্য।
>
> আমার আসল লক্ষ্য, এই প্রস্তাবের মূলে যে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য আছে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেওয়া। 1921 সালে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে এই শাসনবিধিতে সারবস্তু কিছু নেই

এবং মন্ত্রীরা শুধু খেলার পুতুল — যে কারণে কংগ্রেস বিধানসভার বাইরে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই শাসনবিধি অনুমোদনের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় যে হীন ষড়যন্ত্রকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিকার করা। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হল সাধারণ দেশবাসীর মনে এবং প্রাণে প্রতিবাদ গড়ে তোলার যে আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা দেশবন্ধু দিয়ে গেছেন সেটাকে সমূলে বিনষ্ট করা। এই প্রস্তাবের আরও একটা হীন উদ্দেশ্য হল এই সভায় আমাদের স্বরাজ্য পার্টির যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং প্রতিবাদের যে ক্ষমতা গড়ে উঠেছে — যাকে বাংলা সরকার ভয় পায়, শাসনতন্ত্র ভয় পায়, যার ভয়ে ইংল্যাণ্ডের সরকার সন্ত্রস্ত — সেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা।

স্বরাজ্য পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিতা বজায় রাখার প্রবল আগ্রহে বাংলা সরকার প্রথমে চেষ্টা করল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘটাতে এবং পরে, প্রথমে দুজন আর পরে তিনজন মুসলমান প্রধান মন্ত্রিমণ্ডল নিযুক্ত করতে। সাময়িক ভাবে শক্তি কিছু কম হলেও, স্বরাজ্য পার্টি অচিরে সামলে উঠে মন্ত্রিমণ্ডলকে বেশ ভাল ভাবেই পরাস্ত করতে সক্ষম হল। বঙ্গীয় বিধানসভায় সেটাই স্বরাজ্য পার্টির শেষ সাফল্য।

বঙ্গীয় বিধানসভায় চাঞ্চল্য

বঙ্গীয় বিধানসভায় প্রবল চাঞ্চল্য ঘটে 1926 সালের 18 ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে। সভার অধিবেশন যখন চলছে, চট্টগ্রামের অন্যতম প্রতিনিধি নুরুল হক চৌধুরী (কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট) বিচারাধীন প্রস্তাবে এক সংশোধনের দাবী জানালেন। সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর তা নামঞ্জুর করে দেওয়ায় চৌধুরী সাহেব মন্তব্য করলেন 'এটা সভাপতির ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার'। মহা ক্ষিপ্ত হয়ে সভাপতি তাঁকে মন্তব্যটি আর একবার করতে বললেন। হক চৌধুরী নীরব থাকলেন। সভাপতি আবার তাঁকে মন্তব্যটি পুনরুক্তি করতে বললেন। হক চৌধুরী আবার একই মন্তব্য করলেন। সভাপতি তাঁকে মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বললে চৌধুরী সাহেব তাতে রাজি হলেন না। সভাপতি তখন অধিবেশনে আপত্তিজনক আচরণের অপরাধে হক চৌধুরীকে সেদিনের মতো সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন।

হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে হক সাহেব বলে গেলেন 'আপনি (সভাপতি) যথেচ্ছচারী'। এই মন্তব্যে মহা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল এবং বিরুদ্ধ পক্ষ চিৎকার করে উঠল 'শেম! শেম!' ক্রোধান্ধ সভাপতি কুমুদশঙ্কর রায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন চিৎকার করার অপরাধে ওঁকেও বেরিয়ে যেতে হবে। এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির দুজন সভ্যকে বের করে দেওয়ার প্রতিবাদে যতীন্দ্রমোহন কড়া ভাষায় বললেন ঃ

শেম শেম বলে চিৎকারের সামান্য অপরাধে সভাপতি পর পর দুজন সভ্যকে অধিবেশন থেকে

বের করে দেওয়ার বালখিল্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি 'শেম' কথাটা আইনতঃ সিদ্ধ এবং হাউস অফ কমন্সেও ব্যবহৃত হয়। কাজেই সভাপতির ব্যবহার আপত্তিজনক বলে আমি মনে করি।

সভাপতি তখন যতীন্দ্রমোহনকে বললেন 'বালখিল্য' কথাটা প্রত্যাহার করতে এবং রাজি না হওয়ায় তাঁকেও নির্দেশ দিলেন বেরিয়ে যেতে। পার্টির নিয়মানুগত্য রক্ষা করে অন্য দুজন সঙ্গীর ভাগ্য উনিও ভাগ করে নিলেন। ফলে, অধিবেশনে হট্টগোল আরও বাড়ল এবং পার্টির আর এক সভ্য চিৎকার করে মন্তব্য করলেন 'আমার মতে সভাপতির আচরণ শুধু বালখিল্যই নয় তারও অধম। 'অতএব তাঁকেও যেতে হল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে গেলেন আরও একজন যিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন, 'সভাপতির ব্যবহার বাতুলতার সামিল।'

এরপর স্বরাজ্যীয় এবং স্বাধীন সভ্যরা সকলেই বেরিয়ে গেলেন — শুধু বি. চক্রবর্তী ছাড়া। তিনি যে কেন বেরিয়ে যাননি তার কারণ শুধু তিনিই জানেন।

পরদিন 19 ফেব্রুয়ারী যখন অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল পর পর পাঁচটি অনাস্থা প্রস্তাব দিয়েছেন ডাঃ বিধান রায়, নলিনী সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বি এন শাসমল এবং আবদুল রব চৌধুরী। শাসমলের অনাস্থা প্রস্তাব ছিল আগের দিন সভাপতির আচরণের প্রতিবাদে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পার্টির নেতা যতীন্দ্রমোহন জানালেন যে "এটা সভাপতির ব্যবহারের প্রতিশোধ নয়, ন্যায়সঙ্গত ভাবে নির্বাচিত সভ্যদের বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র শাসকদলের সভ্যদের ওপর নির্ভর করে সভাপতির মানরক্ষা প্রচেষ্টার প্রতিবাদ।"

প্রস্তাবটি পরাজিত হল (57:72) ঠিকই কিন্তু সভাপতির মান এবং মর্যাদার যথেষ্ট হানি হল।

স্বরাজ্যীয়দের সভা পরিত্যাগ (15-**ই মার্চ** 1926)

কানপুর কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী স্বরাজ্য পার্টি সিদ্ধান্ত নিলেন বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করার। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সভাকে জানালেন ঃ

সভাপতি মহাশয়, আপনি হয়তো জানেন যে কানপুর কংগ্রেসের যে কর্মপন্থার নির্দেশ দিল্লীতে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সুবিবেচনার পর অনুমোদন করেছেন সেই নির্দেশানুযায়ী স্বরাজ্য পার্টির সমস্ত সভ্য আজ এই সভা থেকে বিদায় নেবেন।

দু'বছর আগে এই বিধানসভায় যোগদান করে আমরা চেয়েছিলাম যে জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে শাসনতন্ত্র চালাবার যে মিথ্যাচার, সরকারের সেই মুখোস খুলে দিতে। দ্বৈত-শাসন আমরা শেষ করেছি। আজ আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বহির্জগৎ থেকে আমাদের কর্মপন্থার অনুমোদন নিতে। আমাদের ভবিষ্যত নীতির আদর্শে তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি তাঁদের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি পূর্ণ বিশ্বাসে যে এই সভায় আমাদের যে নীতি ছিল তা তাঁরা সমর্থনই করেননি। এই সভায় সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও

আমরা যা করেছি তা তাঁদেরই শক্তির সার্থক প্রয়োগ। আমাদের আরও এবং দৃঢ়তর বিশ্বাস যে এই সভায় আমাদের সংখ্যালঘু হয়ে থাকাটা সুদূর অতীতের সামান্য একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে।

কিন্তু যদি আমরা অধিক সংখ্যায় এবং অধিকতর শক্তি নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে শাসনতন্ত্র তখনও অনমনীয়, তখনও অদম্য, আমাদের স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত চিন্তা এবং আশার প্রতি উদাসীন, তাহলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমাদের নিরস্ত্র, পদানত এবং অত্যাচারিত দেশবাসী অন্য পথ এবং পদ্ধতি অবলম্বন করবেন যা আইনতঃ সিদ্ধ।

বেঙ্গল প্যাক্ট

বিধানসভায়, স্বরাজ্য পার্টি যাতে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে ভাল ভাবে লড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমান চুক্তি করেন (1922-23) যা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। এর গূঢ় রাজনৈতিক পটভূমিকা হল বিধানসভায় মুসলমান সভ্যদের স্বরাজ্য পার্টিতে দলভুক্ত করা যার ফলে বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলকে বার বার পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্যাক্টের ফলে পৌরসভাতেও স্বরাজ্য পার্টির যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল।

রাজনৈতিক সুবিধা ছাড়াও, এই চুক্তির সামাজিক সার্থকতা ছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে জাতীয় শক্তিকে সুদৃঢ় করা — সেটা ছিল না বলেই সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মনোমালিন্য প্রায়ই ঘটত। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীই যে ভারতীয় স্বাধীনতার অনন্য ভিত্তি এ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ছিলেন একমত। সেই প্রসঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্টের প্রাধান্য সুদূরপ্রসারী। বহু বিচক্ষণতায় ব্যাপ্ত ভবিষ্যত চিন্তার পর এই চুক্তি হলেও বাংলাদেশে এবং বাইরে এটা বহু বিরোধের কারণ হয়ে ওঠে। হিন্দু নেতারা চিৎকার করতে থাকেন যে বিধানসভায় মুসলমানদের বেশি আসন দেওয়া হয়েছে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরিতে বেশি সুবিধা। প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস প্যাক্টটি স্বীকার করেন কিন্তু কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে (ডিসেম্বর 1923) এটা বাতিল হয়ে যায়। দেশবন্ধুর জোর তাগিদেও কোন কাজ হয় না। অনেক কথার মধ্যে উনি বলেন 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয় আর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া অসহযোগ আন্দোলন কখনও সফল হতে পারে না, অতএব স্বরাজ পেতে গেলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সাধনা অবধারিত।'

দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে এই অকরুণ প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাঁর ডান হাত, যতীন্দ্রমোহন, বহুবার আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে দুটো উল্লেখনীয় ঘটনা হল ঃ

(1) 23 ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে দ্বারভাঙা মহারাজার সভাপতিত্বে এবং বিপিনচন্দ্র পালকে প্রধান অতিথির আসনে বসিয়ে এক জনসভা হয় এই চুক্তির প্রতিবাদে। যতীন্দ্রমোহন তাঁর চুক্তির সমর্থক সঙ্গীদের নিয়ে এমন ব্যবস্থা করেন যে সভার নিন্দাবাদ একেবারে ম্লান হয়ে যায়।

(2) 28 ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভায় বিরোধ আরও বেশ কিছু তীব্র হয়। সাধারণ সভা বলে ঘোষিত হওয়ায় যতীন্দ্রমোহন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। সভা আরম্ভ হওয়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ লোকই চুক্তির সমর্থক। সভার মনোভাব বুঝে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন যে সভা ডাকা হয়েছে চুক্তিটি যে নিন্দনীয় সেই কথা আলোচনার জন্য অতএব চুক্তির সমর্থকদের কোন স্থান সভায় নেই। সভায় আগুন লাগার পক্ষে তাঁর এই ঘোষণা যথেষ্ট ছিল। গভীর উত্তেজনার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন সমর্থকদের মাত্র একজনকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দিতে। যতীন্দ্রমোহন তখন প্যাক্টের অনুমোদনে তাঁর ভাষণ আরম্ভ করতেই সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন 'সভার কাজ শেষ, মিটিং মুলতুবি করা হল।' অর্থাৎ প্রতিবাদ পর্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই শেষ।

চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহনের কার্যকলাপে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। পরে প্যাক্ট যখন বাতিল হয়ে গেল তখন মহাত্মা গান্ধী বার বার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর জন্যে বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কার্যতঃ কখনও সফল হননি। দুর্ভাগ্যক্রমে, দেশবন্ধুর গঠনমূলক আদর্শে, সাম্প্রদায়িক মিলনের যে পরিকল্পনা ঐ চুক্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেটা বাতিল হয়েছিল নিতান্তই ভুল বোঝার কারণে। জাতীয় ঐক্যের এই ধরনের একাধিক সুযোগ হারাবার পর, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে, জাতীয় কংগ্রেস এবং কিছু রক্ষণশীল নেতার অনিশ্চয়তা আর ভাগ করে শাসন করার ব্রিটিশ কূটনীতির ফলে মুসলীম লিগ্ ব্যবধান বাড়িয়ে পরিস্থিতি রীতিমত ঘোরালো করে দিল। দেখতে দেখতে ধর্মে গোঁড়ামি প্রবল হয়ে উঠল আর তারই কুফল দেখা দিল দু-দশক পরে ভারত ভাগ এবং খণ্ডিত স্বাধীনতায়। চিত্তরঞ্জনের দূরদৃষ্টি আর যতীন্দ্রমোহনের ভবিষ্যত চিন্তা (হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই স্বাধীনতার অনন্য ভিত্তি) অবজ্ঞা করার কুফল আমাদের ভোগ করতে হল।

দেশবন্ধুর ত্রিমুকুট

জাতীয় সংগ্রামের জন্য অবিশ্রাম ছোটাছুটি আর বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড চাপ এবং মুক্তি প্রচেষ্টাকে সহজ, সার্থক এবং দ্রুত করার প্রয়াসে নানান রকম পরিকল্পনা নিয়ে স্বদেশবাসীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে, দেশবন্ধুর ক্ষয়প্রাপ্ত স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ল এবং মাত্র 55 বছর বয়সে হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন দার্জিলিংয়ে (16 জুন 1925)। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটা মস্ত বড় আঘাত। প্রয়োজন বোধে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করে রাজনৈতিক অচল অবস্থা শেষ করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন শেষ বয়সে তারই

কারণে উনি দেশের এবং বিশেষ ভাবে গান্ধীজীর অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সবচেয়ে বেশি যখন তাঁর প্রয়োজন ঠিক সেই সময় মৃত্যু ওঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

গান্ধীজীর প্রশ্ন - চিত্তরঞ্জনের পর কে?

দেশের এই চরম দুর্দশার সময়, ভগ্ন হৃদয়ে গান্ধীজী ব্যকুল হয়ে বললেন "দুর্ভাগ্য যেদিন লোকমান্যকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেদিন আমি নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলাম। সে শোক আমি আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি যদিও আমি তাঁর শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত। দেশবন্ধুর তিরোধানে আমি আরও অনেক বেশি উদ্‌ভ্রান্ত। লোকমান্য যখন গিয়েছিলেন দেশ ছিল আশায় উন্মুক্ত আর আমরা ছিলাম যুদ্ধের মুখোমুখি। কিন্তু, এখন ...?" (ইয়ং ইন্ডিয়া, 25 জুন 1925)।

খুলনা থেকে কলকাতা যাত্রাপথে (দেশবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর) গান্ধীজী এবং তাঁর অতি পুরাতন প্রিয়বন্ধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গাড়ির একই কামরায় ছিলেন। গান্ধীজী এই সুযোগ নিলেন দেশবন্ধুর উত্তরাধিকার কে হতে পারে এই প্রসঙ্গে আচার্যের প্রতিক্রিয়া জানার। 'সেনগুপ্ত সম্বন্ধে আপনার কি মত?' - এইটাই ছিল বস্তুতঃ তাঁর প্রশ্ন। আচার্য দ্বিরুক্তি না করে তাঁর সঙ্গে একমত। যতীন্দ্রমোহনকে খুব ভালভাবে জানতেন বলেই ওঁর মতানুযায়ী 'সে-ই হবে চিত্তের (চিত্তরঞ্জনকে আচার্য এই নামেই ডাকতেন) সব প্রধান ভূমিকায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী।'

যতীন্দ্রমোহন - স্বরাজ্য পার্টির প্রধান

মৃত্যুর 12 দিন পর চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হলে পার্টির মিটিং ডাকা হল শ্রদ্ধেয় নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং সম্ভব হলে, পার্টির সভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে। মিটিং হল খুব বড় আকারে। সমগ্র প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি এলেন প্রায় 400 জন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বিজয়কুমার বসু। মিটিংয়ের দ্বিতীয় কার্যসূচী অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতেই দুজনের নাম প্রস্তাবিত হল — যতীন্দ্রমোহন এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ। যতীন্দ্রমোহনের অনুকূলে মৌলানা নিজের নাম প্রত্যাহার করায় সকলের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনই হলেন স্বরাজ্য পার্টির সভাপতি।

ঠিক সেই সময় গান্ধীজী এলেন মিটিংয়ে এবং সর্বসম্মত নির্বাচনকে করলেন আশীর্বাদ। ছোট্ট বক্তৃতায়, আন্তরিক আনন্দে, ঐকমত্যে নেতা নির্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, এইটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। উনি আরও আনন্দিত এই কারণে যে, যে মানুষটি সর্বান্তঃকরণে সর্বদা চিত্তরঞ্জনের পাশে ছিল এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বিধানসভায় তাঁর কাজ প্রভৃত দক্ষতার সঙ্গে দেখাশোনা করেছেন

তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করলেন নতুন নেতাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে।

তারপর বি পি সি সি-র প্রধান

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম বৈঠক বসল 29 জুন। শোক প্রস্তাব ছাড়াও, প্রধান বিষয়বস্তু ছিল দেশবন্ধুর জায়গায় নতুন সভাপতি নির্বাচন। চিত্তরঞ্জনের সময় দেশপ্রিয় ছিলেন কমিটির সহ-সভাপতি। অতএব, ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁর নামই প্রস্তাবিত হল। তারপরই এল আর একটি নাম — ললিত মোহন দাস — কিন্তু ললিতবাবু তাঁর নাম তুলে নেওয়ায়, সর্বসম্মতিক্রমে যতীন্দ্রমোহনই হলেন সভাপতি। চিত্তরঞ্জনের শূন্য স্থান যে উপযুক্ত মানুষ দিয়েই পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, এই আনন্দে সর্বতোভাবে সব মানুষই সন্তুষ্ট।

মেয়রপদের সমস্যা

এরপরই প্রশ্ন উঠল মেয়রপদ নিয়ে। অন্য দুটো পদের মতন এটা তেমন সহজ ছিল না।

দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠ উপায়ে নেতৃত্বের ব্যাপারে যে সঙ্গতি ছিল, সেটা সমান ভাবে বজায় রাখার জন্য, জাতীয় চক্রে সবাই চাইলেন সাধারণ মানুষের সমন্বয়ের প্রতীক, দেশের দুই প্রধান প্রতিষ্ঠান — স্বরাজ্য পার্টি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিরই উচিত মেয়রপদে নির্বাচিত হওয়া। গান্ধীজীও জোর দিয়ে জানালেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতৃত্বে সঙ্গতি — যার জন্য দেশবন্ধু তাঁর জীবনোৎসর্গ করেছেন — বিশেষ ভাবে দরকার। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করে তিনি প্রভূত যুক্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায়। আইরিশ নেতা ম্যাকসুইনীর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে গান্ধীজী লিখলেন,

> কলকাতা পৌরসভায় চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন যাতে তাঁর কার্যকর ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের তথা সারা বাংলার প্রতীক স্বরাজ্য পার্টির ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে পারেন। তাই বলে তিনি কি পৌরসভাকে অবহেলা করেছিলেন? আমি নির্ভয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি — 'না'। অপর পক্ষে, পৌরসভার কাজ তাঁর কাছে রাজনীতির তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না।
>
> প্রশ্ন হল তাঁর জায়গায় কে এখন মেয়র হবে? এটা ছিল তাঁরই সৃষ্ট পার্টি ক্ষমতার উপহার। এই পদ তাঁরই প্রাপ্য যিনি সেই ঐতিহ্য বজায় রাখবেন — যা ঐ মহান নেতা হস্তান্তরিত করে গেছেন। তাঁরই প্রাপ্য যিনি পার্টির মান ও মর্যাদা আরও বাড়াতে পারবেন। অবশ্য, যদি পার্টির মধ্যে তিনি সেরা মানুষ বলে গণ্য হন — বিশেষ করে পৌর দায়িত্বের পটভূমিকায়। আমার ব্যক্তিগত মতানুযায়ী যতীন্দ্রমোহনই যথার্থভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি, যাঁর মধ্যে সব প্রয়োজনের সদুত্তর আছে। তাছাড়া, তিনি যখন স্বরাজ্য পার্টির নায়ক হিসেবে উপযুক্ত বলে নির্বাচিত তখন দেশবন্ধুর সব গৌরব মুকুট তাঁরই প্রাপ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে তাঁকে সমর্থন করা সকলেরই কর্তব্য।

পারবেন কি তিনি এই তিনটি গুরুদায়িত্ব বহন করতে? ইতিমধ্যেই তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই কমিটির বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কার্যসূচী সুচারু ভাবে সামলে, পারবেন কি তিনি স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব করতে এবং সেই সঙ্গে মেয়রের দায়িত্ব মাথায় নিতে? ভেঙেই যদি পড়েন তাহলে এই তিন মুকুটের প্রয়োজন কি? এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব যতীন্দ্রমোহন নিজেই হলেন অসীম ক্ষমতার উপযুক্ত বিচারক।

গান্ধীজী আরও লিখলেন, "ক্ষমতা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। সেটা হবে বিপজ্জনক পরীক্ষা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজ্য পার্টির নায়কত্বও বিপজ্জনক। দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী তো দূরের কথা, স্বনামধন্য এমন কোন কংগ্রেস কর্মীই কেবলমাত্র নামের মোহে কোন গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস করবে না।

আমার মূল্যবোধে যতীন্দ্রমোহনের স্থান ম্যাকসুইনীর সমকক্ষ। তিনি কর্কের লর্ড মেয়র হতে চেয়েছিলেন, ঐ সম্মানের অধিকারী হবেন বলে নয়, যিনি ঐ পদ গ্রহণ করে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য, তাঁকে বাঁচাবেন বলে। ফলে, ম্যাকসুইনীকে যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার চেয়ে বহুলাংশে বেশি হবে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারীর। ম্যাকসুইনীর ছিল জীবনের ভয়। দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারীর হবে সারা জীবনের সম্মান বিপন্ন। দেশবন্ধু ত্যাগ সাধনা এবং সম্মানের যে মান সৃষ্টি করে গেছেন তার থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে উত্তরাধিকারীর মান এবং মর্যাদা সারা জীবনের মতন নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেটা হবে জীবন্ত মৃত্যু, যা শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। যতীন্দ্রমোহনের মেয়র হওয়া প্রসঙ্গে এই সব কথাই আমি ভাবছি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি এবং আনন্দ বোধ করছি বলতে যে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস মুনিসিপ্যাল পার্টির মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেই এই সব যুক্তি মেনে নিয়ে যতীন্দ্রমোহনের মনোনয়নই সানন্দে স্বীকার করেছেন। আমি আন্তরিক ভাবে আশা করি তাঁরা যতীন্দ্রমোহনের গুরুদায়িত্ব যথাসম্ভব লাঘব করায় সাহায্য করবেন এবং তিনি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এই গুরুদায়িত্বে চিত্তরঞ্জনের মান বজায় রাখতে ...

পৌর কার্যের প্রতি আমার অপরিসীম দুর্বলতা এবং গুরুদায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন হয়েও আমি একই লোকের ওপর এই তিনটি দায়িত্বের বিপজ্জনক ভার দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি তার কারণ, আমার চিন্তাধারায় বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত অ-সাধারণ এবং যার জন্য প্রয়োজন কঠোরই নয় রীতিমত ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ ... ভগবান যতীন্দ্রমোহনকে জ্ঞান দিন, ক্ষমতা দিন ...।

এরপর এল কঠিন বিরোধিতা। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক যাঁরা কংগ্রেসে অথবা স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে একমত ছিলেন না, তাঁরা ছাড়াও কিছু পত্রিকা। বিশেষ ভাবে পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের (যিনি পরে চিত্তরঞ্জনের জীবনী লিখেছিলেন) সম্পাদনায় (সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত) 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহনের মেয়র হওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু বিষোদ্গার করলেন। একটি সম্পাদকীয়তে বলা হল 'উনি চট্টগ্রামে অনধিকার প্রবেশকারী'। ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলো প্রায় একই সুরে গাজন গাইল এই বলে যে আর এক কংগ্রেসি এল কর্পোরেশনের মাথায় চেপে বসতে।

কার্যনির্বাহী সমিতি স্থির করল যে নেতৃত্বে সঙ্গতি বজায় রাখার সমূহ প্রয়োজনে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিকেই মেয়র করা উচিত। 31 ভোটের বিরুদ্ধে 6 ভোটে

কংগ্রেস ম্যুনিসিপ্যাল এসোশিয়েশনও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল। গোপন বৈঠক ছিল না বলে ফলাফলটা সকলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেলেন। 'এটা কি করে হয়?' প্রশ্ন উঠল 'যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে কর্পোরেশনের করদাতাদের তো আপত্তি থাকতে পারে। তাদের সপক্ষে একটাও মিটিংয়ের কথা শোনা গেল না কেন?'

বিভিন্ন পত্রিকায় গাদা গাদা সম্পাদকীয় পড়ে তো সহজেই বোঝা যায় যে কলকাতায় মিটিং ব্যবস্থা করার লোকের যেমন অভাব নেই, বক্তারও তেমনি কোন ঘাটতি নেই। তাহলে? এখানে বা ওখানে এক-আধজন মানুষের 'চাঁটগাঁয়ের তরুণ ব্যারিস্টার' প্রসঙ্গে হয়তো কিছু আপত্তি থাকলেও অধিকাংশ করদাতাই ছিলেন তাঁর সপক্ষে। অ-রাজনৈতিক কোন মানুষকে মেয়র করার মূলে বাইরের কোন দলকে ভেতরে ঢোকাবার যে গুপ্ত প্রচেষ্টা প্রচ্ছন্ন আছে সেটুকু বোঝার কূটবুদ্ধি সাধারণ মানুষের যথেষ্টই আছে।

যতীন্দ্রমোহনের পথ পরিষ্কার

কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহনের মেয়রপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে আরম্ভ হল। মেয়র নির্বাচনের আগে প্রয়োজন ছিল প্রার্থীকে কর্পোরেশনের 'অলডারম্যান' নির্বাচিত হওয়া। কিছু বিরোধী কাউন্সিলর চেষ্টা করলেন ঐ দুই পদের নির্বাচন একসঙ্গে করতে। কংগ্রেস কাউন্সিলররা সচেষ্ট হয়ে সে প্রস্তাব বাতিল করে 14-ই জুলাই 'অলডারম্যান' এবং 16-ই মেয়র নির্বাচনের দিন ধার্য করলেন।

অলডারম্যান নির্বাচন হল তুমুল হট্টগোলের মধ্যে। রায়বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তুলসী গোস্বামী প্রস্তাব করলেন যতীন্দ্রমোহনের নাম এবং বি সি ঘোষ করলেন সেটা সমর্থন। আরও তিনটি নাম প্রস্তাবিত হল — উইলসন, রায়বাহাদুর জে সি ঘোষ এবং স্যার পি সি রায়। আচার্য তাঁর নাম প্রত্যাহার করলেন, তবে কিছু দেরি করে। রায়বাহাদুর হারাধন দত্ত এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাস (দুজনেই মনোনীত কাউন্সিলর) বহু চেষ্টা করলেন যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি জানাতে কিন্তু বক্তব্য তাঁদের ডুবে গেল কংগ্রেস নেতাদের সমর্থনের প্রবল উচ্ছ্বাসে। ভোটের ফলাফলে দেখা গেল যতীন্দ্রমোহন জিতেছেন 48 ভোটের ব্যবধানে। বিরোধীরা পালাতে পথ পেল না। চিত্তরঞ্জনের জায়গায় যতীন্দ্রমোহনই হলেন 'অলডারম্যান'।

কর্পোরেশন কাউন্সিলের অ-সাধারণ বৈঠকে মেয়র নির্বাচন হল তিন দিন পর। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পরিভ্রমণে এসে সর্দার বিঠলভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, যমুনাদাস মেহতা, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, নেলী সেনগুপ্তা এবং অন্যান্য বহু নাগরিক।

পরিশেষে নির্বাচিত মেয়র

নির্বাচন মিটিং হল উপ-মেয়র এইচ এস সুরাবার্দির সভাপতিত্বে। অলডারম্যানের অঙ্গীকার নেওয়ার পর শুরু হল মেয়র নির্বাচনের পালা। যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রস্তাব করলেন মনোনীত কাউন্সিলর রায়বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাব সমর্থন করলেন এস এ রজ্জাক এবং অলডারম্যান চাঁদ হুসেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে এক য়ুরোপীয় সভ্য জানালেন প্রতিবাদ। কাউন্সিলর স্টুয়ার্ড স্মিথ প্রস্তাব করলেন জি মর্গ্যানের নাম এবং তাঁকে সমর্থন করলেন মিস্ লয়েড। তারপর আরম্ভ হল ভোট পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ। মর্গ্যান সমর্থকরা চাইলেন ব্যালট-বক্সের ব্যবহার আর কংগ্রেস কাউন্সিলররা দাবী হাত তুলে সম্মতির। সংখ্যাগুরুত্বে তাঁদের দাবি সমর্থিত হওয়ায় সেই পদ্ধতিই হল প্রযোজ্য এবং যতীন্দ্রমোহন জিতলেন 52-17 ভোটে।

মেয়র হিসেবে কাজ

মাঝে সামান্য কিছু সময় ছাড়া (যার কথা পরে বলা হবে) যতীন্দ্রমোহনের পর পর পাঁচবার মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়া কর্পোরেশনের ইতিহাসে অনন্য। রাজনৈতিক নেতা (কংগ্রেস) ছিলেন বলে প্রথমাবস্থায় প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদীদের, বিশেষভাবে য়ুরোপীয় কাউন্সিলরদের মতবাদ বদলে গেল যখন তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখলেন যে মেয়রের আসনে যতীন্দ্রমোহন জনতারই মানুষ। ব্যক্তিত্বে উনি ছিলেন প্রান্তিকভাবে পৌরনেতা; পার্টি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সব বিভেদ উত্তীর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, উদার এবং সমবেত ভাবে নাগরিকদের উন্নতির জন্য অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলার মানুষ।

মেয়র হিসেবে তাঁর প্রথম মেয়াদের (1925-26) লক্ষ্যণীয় কাজ হল মেয়েদের জন্য বহু প্রাথমিক স্কুলের প্রবর্তন। ধর্মযাজকদের কিছু স্কুল ছাড়া, এই স্কুলগুলোর মান ছিল বেশ উঁচু। চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, শৌচ-প্রণালী এবং জল সরবরাহ, খাদ্য এবং দুগ্ধ পরিবেশনা, পথ-ঘাট এবং যানবাহনের ব্যবস্থা, প্রতিটি বিষয়েই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিভিন্ন বস্তির সংস্কার করেছিলেন, 'ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয় আর আরম্ভ হয় সমবায় সমিতির ব্যাপক প্রচলন। সবার ওপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের দিকে। ওঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই হল জাতীয় উন্নতির অনন্য ভিত্তি এবং এই প্রসঙ্গে ওঁর পদক্ষেপ ছিল পরমগুরু চিত্তরঞ্জনের অনুসরণে। সীমিত কিন্তু সুষ্ঠু মেয়াদে মেয়র হিসেবে চিত্তরঞ্জন যে সব প্রগতিমূলক উন্নতির আদর্শ স্থিরীকৃত করেছিলেন, যতীন্দ্রমোহন সেগুলো কার্যে পরিণত করার, বলা যায়, সাধনা করেছিলেন। ওঁর কর্মসূচী ছিল যথার্থভাবে দেশবন্ধুর অনুরূপ। কলকাতার মেয়রের মর্যাদাপূর্ণ পদে

অধিষ্ঠিত যতীন্দ্রমোহন ছিলেন ভারতে সবচেয়ে বড় এবং এশিয়া আর ব্রিটিশ কমনওয়েলথে দ্বিতীয় শহরের পৌর-শিরোমণি।

1926 সালের মার্চ মাসে মেয়র হিসেবে ওঁর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আবার উনি ঐ পদের জন্য প্রস্তাবিত হলেন 1-লা এপ্রিলের নির্বাচনী সভায়। এম এ রজ্জাকের সমর্থনে ওঁর নাম প্রস্তাব করলেন শরৎচন্দ্র বসু। আর কোন নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় আনন্দ কোলাহলের অধৈর্য উত্তেজনায় সর্বসম্মতিক্রমে যতীন্দ্রমোহন মেয়র হলেন দ্বিতীয়বার। ওঁর প্রথম মেয়াদ মাত্র আট মাসের জন্য হলেও (দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাকি সময়টুকু) উনি পৌরসভার প্রত্যেক বিভাগের এবং সব শ্রেণীর পৌরকর্মীদের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে প্রশংসা এবং পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। নাগরিকদের অন্তরও যে উনি জয় করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়বার নির্বাচনে বিশিষ্ট কাউন্সিলরদের অভিনন্দনে যতীন্দ্রমোহন অভিভূত হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একদা বিরোধী নেতা চারুচন্দ্র বিশ্বাস, রায়বাহাদুর এন এন বসু এবং ওয়াটসন। এঁরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন পৌরপ্রধান হিসেবে ওঁর দায় এবং দায়িত্ববোধের। এঁরা বলেন যে বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয় হল, দলীয় রাজনীতি উত্তীর্ণ হয়ে পরম একাগ্রতায় ওঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। করদাতাদের স্বার্থই যাঁর কাছে সবার উর্ধ্বে এবং কর্তব্যের মূলমন্ত্র, কলকাতার মতন মহানগরের মেয়র পদের মর্যাদা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সে গৌরবের সর্বতোভাবে উপযুক্ত একমাত্র উনিই। ওঁর দ্বিতীয় মেয়াদ আরও সফল এবং সার্থক হওয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ঐ সভা শেষ হয়।

সংবর্ধনা এবং শুভেচ্ছা স্বীকৃতিতে যতীন্দ্রমোহনের আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণ ছিল প্রকৃত কর্মযোগীর প্রশান্ত নিবেদন।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'শুভ কাজে শত বাধা'। মেয়র হিসেবে ওঁর দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ 2 এপ্রিল শহরে আরম্ভ হল তুমুল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সূত্রপাতের কারণ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর মোড়ে এক মসজিদের সামনে দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে আর্য সমাজীদের যাওয়া এক শোভাযাত্রা। সমগ্র বড়বাজারে দাঙ্গা ছড়াল। বহু হতাহত হল। দাঙ্গা চলল সারা রাত, আর দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল শহরের মধ্য এবং পূর্ব এলাকায়। সমগ্র শহরে গভীর আতঙ্ক, বিক্ষিপ্ত ভাবে ভয়াবহ সংঘর্ষ। আক্রান্ত এলাকায় জীবন বা বাড়িঘরের কোনই নিরাপত্তা নেই।

সাধারণ প্রচেষ্টা তো দূরের কথা, সরকারি স্তরেও এই অদ্ভুত 'মসজিদের সামনে বাজনা' সমস্যার কোনই সমাধান পাওয়া যায়নি। এটা বলা চলে 'ভাগ করে শাসন করা'-র ব্রিটিশ নীতির একটা অংশ এবং এর সাফল্যে বিদেশী শাসনতন্ত্র সবিশেষ

উদ্ভাসিত। এই নীতির সমূহ বিপদ দেখেই, চিত্তরঞ্জন সর্বকালীন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ঐকান্তিক সাধনায় 'বেঙ্গল প্যাক্ট' করেছিলেন। সমগ্র ভারত তাঁর দূরদৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়ে সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কানপুর কংগ্রেস অধিবেশনে সেটা সমর্থন করেন। গুরুর সেই নীতি অনুসরণ করে যতীন্দ্রমোহনও চেষ্টা করেন পৌরসভায় এবং সাধারণ জীবনে সেটা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু মানুষ কিছুতেই বুঝল না বাংলার তো বটেই সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে দেশবন্ধুর ঐ দান কি এবং কতখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অচিরে ভাঙন ধরল এবং দেশকে তার দাম ধরে দিতে হল দেশ দু'ভাগ হয়ে।

যাই হোক, পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হল। সমগ্র শহর অচল, পৌর কার্যও সব বন্ধ। বিশিষ্ট নাগরিক এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে যতীন্দ্রমোহন শান্তিবাহিনী গড়ে তুললেন বিভিন্ন এলাকায়। ওঁর সঙ্গে সানন্দে যোগ দিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ('সারভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক), কিরণ শঙ্কর রায়, ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় এবং অন্যান্য অনেকে। আক্রান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের তাঁরা বোঝালেন রক্তপাত বন্ধ করে স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার অনন্য পথ হল সদ্ভাব, সহনশীলতা এবং স্থৈর্য। এ ছাড়াও ব্যাকুল আগ্রহে যতীন্দ্রমোহন সহযোগিতা চাইলেন যুবক এবং ছাত্রদের। সানন্দে তাঁরা দিল সক্রিয় সাড়া। স্থানীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন তাঁরা স্তূপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে পথঘাট পরিষ্কার করতে। এমন কি মল পরিষ্কারেও তাঁরা পিছপা হলেন না। প্রেরণার উৎস তাঁরা পেলেন পাশের মানুষ যতীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে — যিনি সাম্প্রদায়িক দানবের সঙ্গে যুঝতে, দিনের পর দিন এসে দাঁড়ালেন সকলের পাশে। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ফিরে এল শান্তি।

সাধারণ স্বাভাবিক জীবন সর্বতোভাবে ফিরে এলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সনাতনী সদ্ভাব এবং একতা আগের মতন সুষ্ঠুভাবে ফিরিয়ে আনা শক্ত হয়ে উঠল। যা কিছু ঘটে গেছে তার প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার বিভিন্ন জেলাতেই নয় বস্তুতঃ সমগ্র দেশ জুড়েই দেখা দিল। ফলে, 15 জন মুসলমান কাউন্সিলর পদত্যাগ পত্র দিলেন। সেগুলো অবশ্য যতীন্দ্রমোহন স্বীকার করলেন না। পাছে তার প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য আবার বেড়ে যায়। তিনি তাঁর শান্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন, যদিও কিছু গোঁড়া হিন্দু কাউন্সিলর এবং কিছু বাইরের লোক তাঁর খুবই নিন্দা করলেন। পরে অবশ্য 12 জন তাঁদের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিলেন।

বছরের শেষে য়ুরোপীয় অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি ল্যাংফোর্ড জোন্স তাঁদের বাৎসরিক অধিবেশনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই সূত্রে যতীন্দ্রমোহন জড়িয়ে পড়লেন এক বিতর্কে। বাংলার গভর্নর লর্ড লীটন এবং লর্ড আরউইন দুজনেই সেই অধিবেশনে ছিলেন বিশেষ অতিথি। তাঁদের উপস্থিতিতেই ল্যাংফোর্ড জোন্স বেশ জোর গলায় বললেন যে নিজেদের স্বার্থ বাঁচিয়ে এবং ভারতীয়দের এড়িয়ে য়ুরোপীয়দের

উচিত শুধুমাত্র নিজেদের ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে যাওয়া। ভারতীয়দের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই এবং তাদের উন্নতি করার কথা ভাবারও কোন প্রয়োজন নেই। আসলে তাঁর বক্তব্য ছিল ভারতে য়ুরোপীয় স্বার্থের নিরাপত্তা। পরদিন বিভিন্ন পত্রিকায় ল্যাংফোর্ড সাহেবের বক্তৃতা বড় করে ছাপা হল। দেশের প্রতি য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের মনোভাব দেখে প্রতিটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসী প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠিক করলেন এর প্রতিবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি এ পি আই (বর্তমানে পি টি আই) মাধ্যমে এক বিবৃতিতে বললেন ঃ

আমার মতে, কোন ভারতবাসী, ভারতে অবস্থিত সরকারি অথবা বে-সরকারি য়ুরোপীয়দের মধ্যে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য দেখেন না এই সেদিন রাত্রে, লর্ড লীটন নিজে ভারতবাসী এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের আবেদন করেছিলেন। য়ুরোপীয় অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি সেই আবেদনের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন 'না'। বাংলার লাট এবং ভারতের বড়লাট ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে উপস্থিত থাকলেও কোন প্রতিবাদ তাঁরা করেননি। অতএব মনে হচ্ছে তাঁর সহযোগিতার নিবেদন ছিল নিছকই কৌতুক 'আর ল্যাংফোর্ড' সাহেবের বক্তৃতা যতীন্দ্রমোহন ধর্তব্যেই আনতেন না 'যদি না তিনি হতেন য়ুরোপীয় অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি।'

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে'' যতীন্দ্রমোহন জোর দিয়ে বললেন ''এবং বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টির নেতা আর কলকাতার মেয়র হিসেবে আমি মনে করি এ প্রসঙ্গে চেতাবনী নিতান্তই প্রয়োজন। আমার সমস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, সাধ্যমত সমস্ত শক্তির জোর দিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গত মঙ্গলবার রাত্রে (13 ডিসেম্বর 1926) যে মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি, ল্যাংফোর্ড জোন্স এবং তাঁর সমসাময়িকরা যদি আবার সেই ধারায় কথা বলেন তাহলে আমার মনে হয় প্রত্যেক দেশবাসী অনতিবিলম্বে য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না। সম্প্রতি যে কটূক্তি আমরা শুনেছি তার বিরুদ্ধে আমি ল্যাংফোর্ড জোন্স এবং তাঁর বন্ধুবর্গকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি। ভগবানের চাকা কিছু আস্তে ঘোরে ঠিকই কিন্তু চূর্ণ করে ধূলোর মতন। সাম্প্রতিক চীনের ঘটনাবলী দেখে আত্মম্ভরী য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের চোখ খোলা উচিত।

যতীন্দ্রমোহনের দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচনকালে আর একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হল বিনা বিচারে রাজবন্দী, ওঁর সহকর্মী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি প্রসঙ্গে ওঁর উদ্যোগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মেয়র ছিলেন তখন সুভাষবাবু ছিলেন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যকরী অফিসার। জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তিনি জেলে যান 1924 সালে। রাজবন্দী থাকাকালীন ঐ দেশভক্ত অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশ শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং যতীন্দ্রমোহন কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভা ডাকেন সরকারি ভাবে প্রধান কার্যকরী অফিসারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে মুক্তির দাবী জানাতে।

এই মিটিংয়ে প্রস্তাব পেশ করার সময়, অবিলম্বে সুভাষবাবুর মুক্তি দাবী করেন যতীন্দ্রমোহন মর্মস্পর্শী আবেদনে। লর্ড আরউইনের বক্তৃতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''আজ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন তরুণ এবং জাতীয়

কর্মীদের বিনা বিচারে সরিয়ে ফেলার অপ্রতিহত ক্ষমতা, যাতে সরকারি শাসনতন্ত্র অব্যাহত থাকে" এবং সরকারকে সাবধান করে দেন যে "এইসব যুক্তির আড়ালে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা গোপন করার ভুল যেন তাঁরা না করেন।"

বেশ জোর দিয়েই তিনি বলেন "কর্পোরেশনের এই আবেদন লর্ড আরউইন বিবেচনা করে দেখুন। সমস্ত ইংরেজ ভেবে দেখুন। আমি ভারতে এবং বাইরে, সমগ্র ভাবে মানবতার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন ভেবে দেখেন যে আপনারা যাঁরা রাজ্যের নিরাপত্তার অজুহাতে নিজেদের রক্ষক এবং রক্ষা দেবতা বিষ্ণু বলে মনে করেন — সেই আপনারা, যে ব্যক্তিটি রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মশক্তিহীন — তাঁর জীবন বিপন্ন করছেন। আজই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

স্পষ্টতার পরমতম অভিব্যক্তিতে যতীন্দ্রমোহন বলেন, "আমি আমার আবেদন জানাচ্ছি মানবতার আদালতে। আমাদের ভারতবাসীর হাতে আজ এমন কোন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে আপনাদের ভয় দেখাতে পারি, জোর করতে পারি। অপর্যাপ্ত ক্ষমতার মধ্যে বসে বিবেকের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনুন" — 'সুভাষকে মুক্তি দাও'। সমস্ত জাতির বোবা কান্নায় আজ সুভাষ মুক্তির আবেদন। যে ক্ষমতা সাম্রাজ্যের মূল এবং ব্যক্তিগত চিন্তার সূত্র তারও ঐ একই চিৎকার 'মুক্তি দিন, সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিন।'

যাঁরা সেদিন কর্পোরেশনের সভায় যতীন্দ্রমোহনের মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনেছিলেন অথবা পরদিন সকালে পত্রিকায় পড়েছিলেন তাঁরা এবং সাময়িক বাংলার নিরপেক্ষ মানুষরা বুঝতেই পারেননি যে ঐ দুই দেশভক্ত বঙ্গসন্তান, যাঁদের বয়সের অথবা অভিজ্ঞতার পার্থক্য অত্যন্ত অল্প, যাঁরা দুজনেই দেশবন্ধুর এবং দেশের সমান ভাবে প্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

এরও বহু আগে আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল যখন অসহযোগ আন্দোলনে দুজনে একই সঙ্গে আলিপুর জেলে আটক ছিলেন। ওঁরা দুজন এবং আরও বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং নেতা জেলকর্মীদের লাঠি চার্জে আহত হন। তাঁদের মধ্যে সুভাষবাবু বেশ গুরুতর ভাবে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাই দেখে যতীন্দ্রমোহন ছুটে গিয়ে তাঁর সেবা করেন এবং হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এই রকম ছোটখাটো বহু ঘটনায় সপ্রমাণিত হয় যে তাঁদের মধ্যে তখনও কতখানি আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু রাজনীতিতে অনেক কিছুই রাতারাতি বদলে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং সবাই যাকে বলত নেতৃত্বে যতীন্দ্রমোহনের 'ত্রি-মুকুট' ধারণের পর বঙ্গীয় রাজনীতিতে কিছু রেষারেষি আরম্ভ হয়ে যায়। যদিও যতীন্দ্রমোহনকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে তবুও বিপক্ষবাদী একটি দল গড়ে ওঠে 'পঞ্চ নেতা' নামে। বলা হয় যে এই দলে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং গান্ধীজীর গুণে মুগ্ধ যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে

তাঁর মুক্ত হৃদয়ের ঔদার্যের বিরুদ্ধে অনেক কিছু ষড়যন্ত্র করেন। যে সব কংগ্রেসকর্মী সর্বতোভাবে এবং শেষপর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা ছাড়াও অগণিত মানুষ অসীম আগ্রহে তাঁর অনুরক্ত ছিলেন বলে এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সত্য এবং স্বচ্ছ ছিল বলে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য ক্রমশ বেড়েই উঠেছিল।

বঙ্গীয় রাজনীতির এই রেষারেষি এবং স্বার্থসিদ্ধিতে আগ্রহশীল কিছু মানুষের এই সব নোংরা কার্যকলাপ দেখে নিরপেক্ষ দর্শকরা বুঝেছিলেন যে তাঁরা ভবিষ্যতের ফলাফল ভুলে গিয়ে জলই শুধু ঘোলা করছেন। এতে সুভাষচন্দ্র হয়ে গেলেন নিমিত্তের ভাগী। এ যেন ঠিক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। যতীন্দ্রমোহনের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে কোন ভাবে যদি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠক হয় তাহলে সব কিছু সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সে বৈঠক কখনও বসেনি এবং বাংলার ভাগ্যে ছিল বহুকাল তার দুর্ভোগ সহ্য করা।

পরের বছর যতীন্দ্রমোহনের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটল মেয়র হিসেবে তৃতীয়বার নির্বাচনে (27 এপ্রিল 1927)। দ্বিতীয় নির্বাচনে উনি জয়ী হয়েছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে। এবার হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দ্বিতীয়বার মেয়র হওয়ার পরই ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার ফলে, ওঁর শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেও, কিছু মুসলমান কাউন্সিলর দূরে সরে যান। তবুও নির্বাচনে মহম্মদ আলি সমেত তাঁদের অনেকেই যতীন্দ্রমোহনকে ভোট দেন। বিপক্ষে ছিলেন উদারনীতি দলের কাউন্সিলর যতীন্দ্রনাথ বসু। যতীন্দ্রমোহন জেতেন 45-39 ভোটে। দ্বিতীয়বার গণনায় দেখা গেল ওটা 46-39 কারণ প্রথম গণনায় সভাপতি নিজের ভোট দেননি। যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রস্তাব করেন রায়বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন দাউদ। চাঞ্চল্যকর নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহনের জয়লাভে, সভায় উপস্থিত সকলেই তুমুল জয়ধ্বনি দেন আনন্দের আতিশয্যে।

কিছুকাল যাবৎ, রাজনীতি এবং প্রগতি আন্দোলনের আড়ালে বাংলাদেশ এক সামাজিক পঙ্কিলতায় ডুবছিল — অনূঢ়া, এমন কি বিবাহিতা কন্যা অপহরণ এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপক প্রয়োগ। ধীরে ধীরে সমস্যাটা বেশ বিরাটাকার হয়ে উঠেছিল। কিছু সমাজসেবীর কথায়, সরকারী মহলে বাংলার লাট লর্ড লীটন এই সব মেয়েদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। সময় সময় উদ্ধারের পরও মেয়েরা উধাও হয়ে যেত আর না হয় সমাজে স্থান পেত না। সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই সমস্যার প্রাসঙ্গিক কোন প্রতিক্রিয়া না থাকায় লর্ড লীটন যতীন্দ্রমোহনকে আহ্বান জানালেন তাঁর প্রতিপত্তির মাধ্যমে সর্বসাধারণকে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসুলভ উৎসাহে যতীন্দ্রমোহন এই মানবীয় কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্পোরেশনের মাধ্যমে মেয়র ফাণ্ড শুরু করলেন দুস্থ মহিলাদের সাহায্যে এবং উদারচিত্ত মানুষদের কাছে আবেদন জানালেন অর্থ সাহায্য করতে।

21 মার্চ 1927 তারিখের এক চিঠিতে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যতীন্দ্রমোহনের এই ত্বরিত কার্যকলাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে, লর্ড লীট্‌ন লিখলেন, 'আমার আমন্ত্রণে, অসহায় এবং বিপন্ন বালিকাদের সাহায্যের ব্যাপারে আপনার অকুণ্ঠ প্রয়াসের জন্য আমি কৃতার্থ।' এবং প্রস্তাব করলেন যে মেয়র ফাণ্ডের টাকা ভিজিলান্স অ্যাসোশিয়েশনকে দিয়ে দেওয়া হোক, যাঁরা এই দুষ্কৃতি দমনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

পরবর্তী গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকশনও পূর্ববর্তী লাটের এই সামাজিক সংশোধনী প্রচেষ্টায় কিছু কম উদ্যোগী ছিলেন না। অর্থ সংগ্রহ সহজ ও সফল করার উদ্দেশ্যে, তিনি প্রস্তাব করলেন তাঁর সভাপতিত্বে এবং মেয়রকে প্রধান উদ্যোক্তা করে টাউন হলে এক সাধারণ সভা ডাকা হোক 11 জুলাই 1927। সভার প্রারম্ভে সভাপতির আসনে গভর্নরকে প্রস্তাব করার সময় তাঁর ভাষণে যতীন্দ্রমোহন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন, গোঁড়া কংগ্রেসি হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যার সভাপতি একজন ব্রিটিশ গভর্নর। এটা একটা নাগরিকদের সভা যার অনন্য উদ্দেশ্য হল সামাজিক এবং মানবীয়। 'ওঁরা (প্রশ্নকারীরা) যদি এক পলকের জন্য ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে কোনই অসুবিধা হবে না যে, যে কারণে এবং উদ্দেশ্যে আজ আমরা এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি তা জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা রাজনীতির ধার ধারে না। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সব বাক-বিতন্ডার ঊর্ধ্বে।'

সাধারণের সাহায্য প্রার্থনায় বিফল হওয়ার পর, লর্ড লীট্‌ন, মেয়রকে আবেদন জানিয়ে যে ত্বরিত উত্তর পান, তার উল্লেখ করে, সভাপতির ভাষণে স্যার স্ট্যানলী বললেন, 'মিঃ মেয়র, আপনার উচ্চপদ এবং প্রভূত প্রতিপত্তি নিয়ে আপনি সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন সাহায্যের প্রচেষ্টায় সহায় হতে। তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত যে এই প্রচেষ্টা আরও অধিকতর ভাবে সফল এবং সার্থক হবে।'

মেয়র প্রস্তাব করলেন (যা সহজেই সভায় স্বীকৃত হল) যে কুখ্যাত এলাকা থেকে উদ্ধার করা অল্পবয়স্ক বালিকাদের জন্য একটা 'উদ্ধার আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করা হোক, আর দেশবাসীদের কাছে আকুল আবেদন জানান এই মহৎ উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে দান করতে। এই প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যার পর যতীন্দ্রমোহন গভর্নরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে সরকারের উচিত যে সব দুর্বৃত্ত অসহায় বালিকাদের অপহরণ করে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের জন্য অবিলম্বে কঠিন আইন প্রবর্তিত করা এবং 'ব্যক্তিগত ভাবে আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত' উনি বলেন, তাহলে উনি শুধু সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানারই ব্যবস্থা করতেন না, ঐ সব হীন অসামাজিক দুর্বৃত্তদের প্রকাশ্য রাজপথে চাবুক মারারও ব্যবস্থা করতেন।

উপসংহারে গভর্নর খুবই সুন্দর ভাবে তাঁর বক্তব্যে বলেন 'মেয়র সাহেব বলেছেন যে আমরা দুজন একসঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছি দেখে অনেকেই আশ্চর্য

হবেন। আমি নিজে খুবই আশ্চর্য হতাম যদি এই ব্যাপারে আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি না দাঁড়াতাম। আপনি হলেন শহরের শিরোমণি আর আমি — সৌভাগ্যই বলুন কি দুর্ভাগ্য (সকলের হাসি) — গভর্নরের আসনে অধিষ্ঠিত। আমরা দুজন দু'জায়গায়। আপনার উদ্দেশ্য হল কলকাতার সমৃদ্ধি। আমারও তাই এবং সামান্য কিছু বেশি — শুধু কলকাতার নয়, সমগ্র বাংলাদেশের।' তিনি যতীন্দ্রমোহনের বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে এই মানবীয় দায়িত্বে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

বছরের শেষ ভাগে (1927) সুভাষচন্দ্রের মুক্তির পর প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বে কিছু রদবদল হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসার পর তাঁর সহচর অনুচর এবং অনুগামীদের উৎসাহে এবং সংখ্যাগুরুত্বে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বভাবতই 1928 সালের মেয়র নির্বাচনে তিনিই ঐ পদের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। 1925 থেকে পর পর তিন বছর মেয়র হওয়ার পর যতীন্দ্রমোহনের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না ঐ পদের জন্য আবার প্রার্থী হওয়ার। উনি প্রকাশ্য ভাবে সে কথা জানিয়ে সুভাষচন্দ্রের জন্যই কাজ শুরু করে দেন, কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ অ-কংগ্রেসি কাউন্সিলর যেমন মুসলমান, মনোনীত য়ুরোপীয় এবং অন্যান্যরা চাইলেন পরিবর্তন আর ঝুঁকে পড়লেন অ-কংগ্রেসি প্রার্থী বিজয় বসুর দিকে। কংগ্রেসি কাউন্সিলররা ছিলেন সংখ্যালঘু আর প্রতাপশালী মনোনীত কাউন্সিলর ফিলিপ্স এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাস আলাদা ভাবে চেষ্টা করেছিলেন যতীন্দ্রমোহনকে প্রার্থী হওয়ার জন্য রাজি করাতে। তা না হলে তাঁরা বিজয় বসুকেই ভোট দেবেন। যতীন্দ্রমোহন রাজি না হয়ে সুভাষচন্দ্রের সপক্ষেই কাজ চালিয়ে গেলেন আর সুভাষচন্দ্র নিজেও খুবই আশান্বিত ছিলেন যে উনি জিতবেন। নির্বাচন সভায় প্রস্তাবটি পেশ করলেন যতীন্দ্রমোহন নিজে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সামান্য কয়েক ভোটে সুভাষচন্দ্র হেরে গেলেন (2 এপ্রিল 1928) আর কংগ্রেসের হাত থেকে মেয়র পদ বেরিয়ে গেল। বিজয় বসু অবশ্য নিজেই ঘোষণা করলেন যে তিনি পূর্ববর্তী মেয়রের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি বজায় রাখবেন। ফলে, অ-কংগ্রেসি কোন মনোভাব দেখা যায়নি ওঁর কার্যকলাপে।

পরের বছর (1929) প্রাদেশিক কংগ্রেসে রেষারেষি বেশ বেড়ে গেল আর সেটা যখন চরমে তখনই এল মেয়র নির্বাচনের সময়। আগের বছর কর্পোরেশনে কংগ্রেস ক্ষমতা হারিয়েছিল এবং এ বছর কাউন্সিলররা সাধারণ ভাবে চাইলেন যতীন্দ্রমোহনকে আবার মেয়র পদে ফিরিয়ে আনতে।

শরচ্চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভা বেশ সুষ্ঠু পরিবেশেই শুরু হল। প্রার্থীদের নাম প্রস্তাবের কথা উঠতেই দাউদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যতীন্দ্রমোহনের নাম এবং অন্য কোন প্রার্থী না থাকায়, যতীন্দ্রমোহন আবার মেয়র হলেন সর্বসম্মতিক্রমে 10 এপ্রিল 1929। সংবর্ধনা এবং অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ হলে, ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে নতুন মেয়রকে মাল্যদান করলেন শরচ্চন্দ্র বসু।

অত্যন্ত নম্র ভাষায় অলডারম্যান এবং কাউন্সিলরদের সংবর্ধনার উত্তর দিলেন

যতীন্দ্রমোহন। বললেন, 'আপনারা সকলেই জানেন আমি দেশবন্ধু-নীতির অনুগামী। আমার রাজনীতিও আপনাদের অজানা নয়। এই পৌরসভায় কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মসূচী, প্রতিবন্ধক নয়, সৃষ্টিমূলক এবং অগ্রগামী আর, আগের মতন আবার বলছি যে আমার একান্ত প্রয়োজন আপনাদের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা আর সাহায্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণও করিয়ে দেওয়া দরকার যে ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে দেশ বড় এবং আমার কাছে সবচেয়ে বড় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যার জন্য আমাদের কার্যসূচি একাগ্র ভাবে এই মহান শহরের সর্বজনীন কল্যাণ।'

সবাইকে অবাক করে তিনি আরও বলেন, 'আমরা য়ুরোপীয়দের বিরোধী নই। মুসলমানদেরও বিরোধী নই। সমবেত ভাবে, আমরা বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে জাতীয় আর, সেটা যদি হয় রাজনীতি, তাহলে আমরা অবশ্যই এক রাজনীতিক দল।'

সেই বছর যতীন্দ্রমোহন মেয়র থাকাকালীন সমগ্র দেশ, বিশেষ ভাবে কলকাতা শহর হতবাক হয়ে গেল, লাহোর জেলে, রাজবন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদে সুদীর্ঘ অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু সংবাদ শুনে। 93 দিন অনশন করে যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিলেন (13 সেপ্টেম্বর 1929) স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বলতম শহীদ হয়ে। কলকাতাই ছিল যতীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কর্মক্ষেত্রে। কোন এক সময় তিনি ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক।

মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলরদের শোকসভা ডাকা হল। গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সভাপতি যতীন্দ্রমোহন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেছিলেন 'তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য। আমরা জানি যে প্রত্যেক সভ্য দেশে যাঁরা রাজনৈতিক কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কারাবরণ করেন তাঁরা বন্দী অবস্থাতেও, যে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহী, তাঁদের কাছে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন।

> একথা হয়তো মনে হতে পারে যে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে সরকার জিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক বাঙালীর মনে, ভারতবাসীর অন্তরে যতীন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন শ্রদ্ধাস্পদ এবং পূজনীয় এক মহৎ নায়ক আর যে উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন দান করে গেলেন সে উদ্দেশ্য একদিন সফল হবেই। সাময়িক ভাবে সরকার যতই ভাবুক তারা জিতেছে, তারা ভুল ভাবছে। এই ব্যাপারই ঘটেছিল ম্যাকসুইনীর বেলায় এবং যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঠিক তাইই ঘটবে। সরকার অবশ্যই আমাদের দেহ বন্দী করতে পারে কিন্তু চিত্ত তাদের শাসনের বাইরে। সেখানে আমরা চির-মুক্ত, সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন।

পৌরভবনের চূড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

মেয়র-পদে দেশপ্রিয়র চতুর্থ মেয়াদ রাজনৈতিক ভাবে আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। এই ঘটনা ঘটেছিল 1930 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের আন্দাজ এক মাস পর জানুয়ারী মাসে। ঐ অধিবেশনে কংগ্রেস

অবিস্মরণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতার এবং কার্যনির্বাহী সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সমগ্র ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে 26 জানুয়ারী, 1930। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসন থেকে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সকল দেশবাসীকে সচেতন করে তোলা।

দেশ তখন ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন যুগের সূচনায়। প্রথম পর্যায়ের নেতা হিসেবে যতীন্দ্রমোহন কাউন্সিলরদের এক বিশেষ সভায় ডাকলেন 25 জানুয়ারী। উচ্চ রক্তচাপে তাঁর শরীর তখন এতই অসুস্থ যে চলাফেরা তো দূরের কথা, সোজা হয়ে দাঁড়ানোও শক্ত ছিল। তবুও, তাঁর চিকিৎসকের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তিনি মনস্থির করলেন, কোন কারণেই দায়িত্ব এড়ানো চলবে না। মিটিংয়ে গিয়ে সভাপতির আসনে তাঁকে বসতেই হবে।

নেলী সেনগুপ্তা এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সঙ্গে কোন মতে উনি পৌরসভায় পৌছলেন। সেখানে সহ-মেয়র রজ্জাক এবং কাউন্সিলর সন্তোষ বসু তাঁকে ধরাধরি করে বসিয়ে দিলেন সভাপতির আসনে। মিটিং পরিচালনা এবং মেয়রের বক্তৃতা পাঠ করে শোনালেন সহ-মেয়র।

তাঁর সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণে জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন ঃ

> বিবেচনাধীন প্রস্তাবের গুরুত্ব অনেকখানি। একে লঘুভাবে দেখা চলবে না। এরই ওপর আমাদের জীবনের ভিত্তি। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি যে দেশের মতামতে সাড়া দিয়ে, আমরা যে সর্বতোভাবে তাঁদের সঙ্গে আছি, পৌরসভার এই আদর্শ এবং সুনাম সপ্রমাণিত করার জন্য, খুব সামান্য ভাবে এইটুকু অন্তত করা অপরিহার্য।"
>
> যাঁদের অন্য জাতীয় পতাকা আছে, যা আমাদের থেকে আলাদা (য়ুরোপীয় কাউন্সিলরদের) তাঁদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করে মেয়র যতীন্দ্রমোহন বলেন, 'এ কথা নিজেদের কাছে গোপন করে কোনই লাভ নেই যে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা হিসেবে আপনাদের ইউনিয়ন জ্যাক আমাদের সম্ভ্রমের অপমান এবং আমাদের মনে যথেষ্ট বিরোধিতার কারণ। অবশ্যই আমি ব্রিটিশ পতাকাকে অশ্রদ্ধা করছি না, কিন্তু এ অভিযোগও আমি শুনতে চাই না যে আমাদের নিজস্ব পতাকাকে আমি অন্য সব পতাকার উর্দ্ধে বলে মনে করি না।
>
> আজ ডাক এসেছে জাতীয় কর্তব্য পালন করার ... আজ দেশের দাবি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ করার। দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনতায়, পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে এবং পরম শ্রদ্ধায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেয়ে পবিত্র কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

ওঁর ঐকান্তিক আবেগপূর্ণ ভাষণ কাউন্সিলরদের এমনই অভিভূত করে দিল যে প্রস্তাবটি গৃহীত হল বিপুল ভোটে, সপক্ষে 38 এবং বিপক্ষে মাত্র 7 টি। য়ুরোপীয় কাউন্সিলররা সদলে বাইরে থাকলেন এবং মনোনীত কাউন্সিলররা অনুপস্থিত। প্রস্তাবে জাতীয় অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল ঃ

> যে প্রত্যেক পৌরভবনে এবং পৌর প্রতিষ্ঠানে, রবিবার 30 জানুয়ারী 1930 এবং ভবিষ্যতে প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কাজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে আর প্রধান কার্যকরী অফিসারকে অনুরোধ করা হোক যে আগামী কাল জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি যেন অবিলম্বে সমাধা করেন ...।

প্রস্তাবটি যথাযথভাবে পালন করা হল। নাগরিকদের আন্তরিক অভিবাদনে এবং পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। বিদেশী শাসকবৃন্দ এবং য়ুরোপীয় সম্প্রদায় দূর থেকে দেখে নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন ঐ দিনটির বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এরই কিছুদিন পূর্বে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মতামত দিয়েছিলেন যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্পূর্ণ ভাবে আইনসঙ্গত। এতে আপত্তির কিছু নেই এবং কাজটা রাজদ্রোহিতা নয়।

যে শহরের তিনি প্রথম নাগরিক সেই মহানগরে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের পরম পরিতৃপ্তি যতীন্দ্রমোহন পেয়েছিলেন। সমগ্র কলকাতায় এবং শহরতলিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল 26 জানুয়ারী। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের বেশ বড় ধরনের উৎসব হয়েছিল এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকা সত্ত্বেও, ডাক্তারদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যতীন্দ্রমোহন এসেছিলেন তাঁর জাতীয় কর্তব্য পালন করতে। সঙ্গে ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা এবং ব্যক্তিগত সচিব ক্ষিতীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানেও তিনি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বুঝিয়ে বলেন যে এটা জাতীয় স্বাধীনতার অনন্য প্রতীক — যার পূর্তির সাধনায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপস্থিত বিরাট জনতা এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক জনপ্রিয় নেতাকে হার্দিক সংবর্ধনা জানান।

যতীন্দ্রমোহনের ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এবং অফুরন্ত রাজনৈতিক কাজের ভাবনা আর পরিশ্রম থেকে কিছু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, সমুদ্র যাত্রার যে পরিকল্পনা একাধিকবার পরিত্যক্ত হয়েছিল এবার তা অপরিহার্য হয়ে উঠল। 1লা ফেব্রুয়ারী তিনি পত্নী নেলী সেনগুপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করলেন সিঙ্গাপুর।

সেখানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ। গান্ধীজীর লবণ-আইন অমান্য করে রাষ্ট্রীয় আইন অগ্রাহ্য আন্দোলনের যে পরিকল্পনা (মার্চ-এপ্রিল 1930) ছিল তার প্রাক্কালে দেশের রাজনীতিক অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠায় তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কলকাতায়।

ফেরার পথে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করলেন রেঙ্গুনে। কথাটা ওঁর কানে এসেছিল যে বর্মাকে ভারত থেকে আলাদা করে দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনার কারণে বর্মায় অবস্থিত ভারতীয় নাগরিকদের বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রেঙ্গুনে ওঁর

বক্তৃতার পর এক মাসের মধ্যেই ওঁকে জেলে যেতে হল আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে।

একের পর এক দ্রুত ঘটনা ঘটতে লাগল (ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এপ্রিল 1930)। মেয়র হিসেবে ওঁর চতুর্থ মেয়াদ শেষ হল 31শে মার্চ এবং নতুন মেয়র নির্বাচনের দিন স্থির হল 20 এপ্রিল। ইতিমধ্যে 12 এপ্রিল কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে (বর্তমানের আজাদ হিন্দ বাগ) অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর লেখা নিষিদ্ধ বই 'দেশের ডাক' থেকে কিছু পড়ে শোনানোর জন্য রাজদ্রোহিতার অপরাধে ওঁর কারাদণ্ড হল ছ'মাস। এইভাবে পৌর ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সরে যাওয়ার ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠল ঃ এবার তাহলে পরবর্তী মেয়র কে হবেন?

সভা বসল নির্ধারিত সময়ে। মেয়র নির্বাচনের ঐ সভায় সভাপতির আসন নিলেন অলডারম্যান শরচ্চন্দ্র বসু। প্রার্থীর নাম প্রস্তাবের ডাক দিতেই 'অলডারম্যান' ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করলেন যতীন্দ্রমোহনের নাম। প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন কাউন্সিলর ডাঃ যতীন্দ্র মৈত্র। অন্য কোন নাম সভাতে উঠলই না। ফলে, সর্ব সমর্থিত ঐকমত্যে, ওঁর অনুপস্থিতিতেই যতীন্দ্রমোহন পঞ্চমবার নির্বাচিত হলেন মহানগরীর মেয়র। সভার ভেতর এবং বাইরে হাজারো মানুষ দেশপ্রিয়র এই অভূতপূর্ব নির্বাচনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জয়ধ্বনি করলেন পরমোল্লাসে।

জনপ্রিয় কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ কুমার বসু নির্বাচিত হলেন উপ-মেয়র। তিনি নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশপ্রিয়র একটা মাল্য বিভূষিত ছবি রেখে দিলেন মেয়রের আসনে। ভাষায় অবর্ণনীয় সে এক অপূর্ব ঘটনা যার উল্লেখ আছে একমাত্র রামায়ণে।

তারপর শুরু হল অভিনন্দনের পালা। অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত হওয়ার জন্য যতীন্দ্রমোহনের অনবদ্য ব্যক্তিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সবাই। সুললিত কণ্ঠের জন্য প্রখ্যাত কাউন্সিলর শচীন মুখোপাধ্যায় বললেন, "শুধু বাংলাই নয়, সারা দেশ আজ উদগ্র কৌতূহলে উৎসুক ছিল জানতে, এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে কলকাতার অলডারম্যান ও কাউন্সিলররা কি ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।" তারপর, পৌরাণিকী এক উপমা দিয়ে তিনি বলেন, "হাজারো বছর আগে, সত্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসে গেলেন তখন ছোট ভাই ভরত রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিলেন ভ্রাতার পাদুকা সিংহাসনে রেখে। আজ আমার সহকর্মীদের সানন্দ সমর্থনে যতীন্দ্রমোহনের চিত্র প্রতিলিপি রাখা হল মেয়রের আসনে আমি নিশ্চিত যে শারীরিক ভাবে যতীন্দ্রমোহন আমাদের মধ্যে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের সৌরভ সভায় ভরপুর এবং যতদিন তিনি দূরে থাকবেন, এই মহান শহরের মেয়রের সমস্ত দায়িত্ব সসম্মানে পালনের জন্য আমরা ঐ আসনের আলোতেই আমাদের পথ দেখে নেব।"

যতীন্দ্রমোহনের কারাবাস শেষ হল 1930 সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এই জন্য বিধিত আইন অনুযায়ী নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যে অলডারম্যান হিসেবে তাঁর শপথ নেওয়া সম্ভব হল না। এবং সেটা না হওয়ায় মেয়র পদ গ্রহণেও বেশ বাধা পড়ল। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নিজে এর জন্য দায়ী না হলেও আইনের এই বাধা উত্তীর্ণ হওয়ার অথবা বিধিগত নিয়মের ব্যতিক্রম করার কোনই উপায় ছিল না।

রাজনীতি নোংরা, এটা প্রবাদ বাক্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে রেষারেষি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব যা আগে প্রকাশ্য ভাবে দেখা দেয়নি, এবার যতীন্দ্রমোহনের আসর থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিরাটাকারে বেরিয়ে এল বিশ্রীভাবে।

যাই হোক, নিজের ব্যক্তিত্ব, সম্ভ্রান্ত আচার ব্যবহার, চারিত্রিক পরিপূর্ণতা এবং পৌর উন্নতির অসংখ্য দায় ও দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রিয়, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দেশের ও দশের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে, মেয়র পদের যে মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা ইতিহাসে শুধু বিরলই নয়, আজও অনুত্তীর্ণ।

চার

স্বাধীনতা আন্দোলনের চয়নিকা

যে সব মহান ব্যক্তি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্যাগ সাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে অমর হয়ে আছেন যতীন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। সংগ্রামে সামিল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ থেকে (অসহযোগ আন্দোলন, 1921) 1933 সালে অকালে দেহত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর জীবনে অসংখ্য কীর্তি আছে যা অবিস্মরণীয়। তার বৈশিষ্ট্যই নির্ভীক উত্তেজনায়, পরম বিক্রমে এবং প্রগতিশীল উদ্যমে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন অভিযোগের পতাকা তুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান — কলকাতায়, চট্টগ্রামে জালিয়াঁওয়ালাবাগে, দিল্লীতে, রেঙ্গুনে এবং শেষ পর্যায়ে খোদ বিলেতের মাটিতে অসহায়, নিরপরাধ, নিরস্ত্র ভারতবাসীর ওপর তাদের নির্দয় এবং নৃশংস ব্যবহারের বহু নজির দিয়ে। ব্রিটিশরা তাঁর অভিযোগের কোনই উত্তর দিতে পারেনি। তারা শক্তি বা সাহস কোনটাই পায়নি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দিতে। এর ফলাফল যে কি হবে তা যতীন্দ্রমোহন বেশ ভাল করেই জানতেন। জীবন দিয়েই তাঁকে দেশপ্রেমের মূল্য ধরে দিতে হল। সমস্ত দেশবাসী জানেন যে বিনা বিচারে দু'বছর রাজবন্দী থাকাকালীন জেলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সাইমন কমিশনের স্বরূপ প্রকাশ

7 এপ্রিল 1928 বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের বসিরহাট অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় সাইমন কমিশন এবং তার বর্জন সম্বন্ধে এমন কিছু কথা যতীন্দ্রমোহন বলেন যা পরে সর্বভারতীয় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। বহু কথার মধ্যে উনি বলেন ঃ

> ভারত কখনও এই কমিশনকে চায়নি। সাম্প্রদায়িক ব্যবধানের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এই

কমিশন চটপট পাঠিয়েছে যাতে, সমস্যা সমাধানের অজুহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ঐ শৃঙ্খলটা ভাল করে পায়ে এঁটে দেওয়া যায়।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের এই অসৎ উদ্দেশ্য ভারতের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। তাই, সমগ্র দেশ জুড়ে রব উঠেছে 'কমিশন ফেরৎ যাও'। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, খিলাফৎ কনফারেন্স, হিন্দু মহাসভা, লিবারেল ফ্রন্ট প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান সমবেত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই কমিশনকে বর্জন করার।

সর্বতোভাবেই তা যুক্তিপূর্ণ। আমাদের এবং মাতৃভূমির মাঝখানে তৃতীয় পক্ষের প্রাচীর আমরা মেনে নেব কেন? আমাদের উপযোগিতা বিচারের এই অন্যায়, উদ্ধত দাবি কেন আমরা সহ্য করব? সাক্ষ্য প্রমাণের কথা যদি ওঠে তাহলে মুডিম্যান কমিটিতে তা যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। তারপরও এই অহেতুক অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

বন্ধুগণ, আমাদের জন্মগত অধিকার নিয়ে এই ছেলেখেলা আর আমরা কিছুতেই ঘটতে দেব না। ঐ উদ্ধত মানুষগুলো বুঝুক যে আমরা ওদের অগ্রাহ্য করছি। রাজনৈতিক দলসমূহের কমিশন বর্জনের ডাক দেশের কোণায় কোণায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠুক। প্রতিটি মানুষের স্পষ্ট বোঝা দরকার যে এই কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা মানে আমাদের সর্বনাশ।

এই আত্মঘাতি চুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়, কখনই নয়। একতরফা কমিশন নয়। আমাদের দাবি গোলটেবিল বৈঠক। 1921 আর 1924 সালে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আজ কেন তা হবে না? কমিশন কিছুই দিতে পারে না। আর, তাদের কাছে চাইবারও আমাদের কিছু নেই। ...

কমিশনের আসল চেহারা দেখাতে হলে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হয় কেমন ভাবে এই সব লোকগুলো নিজেদের বৃত্তির নির্লজ্জ মিথ্যাচারণ করে। 1922 সালে আইরিশ কনস্টিট্যুশন বিল প্রসঙ্গে স্যার জন সাইমন বলেছিলেন, 'ঐ বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ওটি আয়ারল্যাণ্ড খসড়া করেছেন, আইরিশ লোকেরা করেছেন আইরিশদের জন্য'। আবার আর এক জায়গায় উনিই বলেছেন 'যাই হোক, এতে আশা এবং আস্থার ইশারা আছে কারণ এটা ব্রিটিশ সরকার খসড়া করে আয়ারল্যাণ্ডের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে না। এটা তাঁরাই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন সাম্রাজ্যিক পার্লামেন্টে সমর্থনের জন্য।

অথচ ভারতে আসার আগে থেকেই স্যার জন সাইমন উল্টো সুর গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। যে উদার নীতি আয়ারল্যাণ্ডকে দেখানো হয়েছিল, ভারত প্রসঙ্গে তার সামান্য চিহ্নটুকুও নেই। কেন নেই, সে প্রসঙ্গে 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' লিখছে যে প্রথমত, আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ওদের দাবি ছিল সর্বসম্মত। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নেতারা — যথা মতিলাল এমন শক্তিশালী নন — যেমন ছিলেন মাইকেল কলিনস — অর্থাৎ দাবি পূর্ণ না হলে আয়ারল্যাণ্ড যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল, ভারতের আদৌ সে ক্ষমতা নেই।

অদ্ভুত যুক্তি; কোনই সন্দেহ নেই। যাই হোক, আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে স্যার জন সাইমন যে কথা বলেছেন আমরাও ঠিক সেই পথেই চলব। আমাদের শাসনতন্ত্র আমরাই গড়ব এবং সেই অনুযায়ী শাসনের দাবি জানাব। আর, তা যদি মেনে নেওয়া না হয় তাহলে আয়ারল্যাণ্ডে যা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল তা যদি ভারতে বাস্তব হয়ে ওঠে তার জন্য দায়ী হবেন ওঁরা, আমরা নয়। এই সাইমন কমিশন এসেছিলেন এবং দেশ-ভ্রমণ করে ফিরে গেছেন কয়েকটা মেকি অভ্যর্থনার মালা পরে আর সরকারি ষড়যন্ত্রের ভোজ খেয়ে।

প্রথমেই যতীন্দ্রমোহন বলেন ঃ

যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর (হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার) কোন মূল্যই আমি দিই না

এবং যদিও আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি যে এই জাতীয় সংকটে ওটা শুধুমাত্র অতীতের ইতিহাস তবু, বলতে আমি বাধ্য যে এটা সরকারকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। এ কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধিতার সুযোগ নিয়েই ব্রিটিশ শাসন ভারতে ঢুকে আমাদের দখল করে বসেছে এবং সেই সুযোগ নিয়েই তারা বাঁধন শক্ত করার চেষ্টা করছে আর সেই উদ্দেশ্যেই এই সাইমন কমিশনের আগমন।

কলকাতা কংগ্রেস (1928)

মেয়র না হলেও 1928 সালে যতীন্দ্রমোহন জনসাধারণের তো বটেই, সকলেরই পূজনীয় এবং পরমশ্রদ্ধেয় নেতা বলে স্বীকৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনের ফলে ঐক্যে একটা সহজ আবহাওয়ায় বঙ্গীয় কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রেষারেষির সুরাহা হওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিল। তাছাড়া, সর্বদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যেমন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সমবেত ভাবে বৈঠকে বসল শাসনতন্ত্র খসড়ার জন্য।

1928 সালের কলকাতা কংগ্রেস ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অবিচলিত এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রারম্ভ। মাদ্রাজ (1927) এবং লাহোর (1929) অধিবেশনের মাঝখানে এটা ছিল অত্যন্ত সতর্ক ভাবে প্রস্তুতির অধিবেশন। এই অধিবেশনে মতিলাল ছিলেন সভাপতি, গান্ধীজী ছিলেন 'পথ প্রদর্শক' আর যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অভ্যর্থনার অধিকর্তা। ব্যবস্থাপনার সব কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য তিনি প্রতিটি বিশিষ্ট কলকাতাবাসীকে একান্ত ভাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক, ব্যবস্থাপনায় সুদক্ষ নলিনী রঞ্জন সরকার ছিলেন কংগ্রেস প্রদর্শনীর অধ্যক্ষ আর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং (জি ও সি) পদবী নিয়ে যুবনেতা সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বময় কর্তা। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান আর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কংগ্রেস অধিবেশনে এই প্রথম। সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস নেতারা বাংলা কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একতা এবং আন্তরিকতা দেখে রীতিমত মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রকাশ্য অধিবেশনে এবং সাবজেক্ট কমিটি মিটিংয়ে 'সনাতন পন্থী' এবং প্রগতিশীল নবীনদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ এবং মতবাদ নিয়ে বাকবিতণ্ডা অবশ্যই দেখা গিয়েছিল। সনাতনপন্থীদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজী, মতিলাল আর যতীন্দ্রমোহন যাঁরা স্বভাবতঃই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা যেমন ডব্লু সি ব্যানার্জী, দাদাভাই নওরোজি, লোকমান্য তিলক, আনন্দ মোহন বসু, চিত্তরঞ্জন দাস ইত্যাদিদের উত্তরপুরুষ বলে গণ্য হতেন। নবীন নেতাদের অগ্রভাগে ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীদের দাবি স্বায়ত্ত শাসনের, পরিবর্তে নবীনদের মুক্তকণ্ঠে দাবি ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা এবং

জওহরলালের সংশোধন প্রস্তাব ছিল "ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করলে প্রকৃত স্বাধীনতা কখনও সম্ভব নয়।"

বহু তর্ক বিতর্কের পর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার শর্ত ছিল ব্রিটিশ সরকারকে এক বছরের মধ্যে (31 ডিসেম্বর 1929) কংগ্রেসের দাবি 'স্বায়ত্ত শাসন' স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যথায়, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং কর না দেওয়ার পথ ও পন্থা বেছে নিয়ে সংগ্রাম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিশেষাঙ্গ

যাই হোক, কলকাতা অধিবেশনের অনবদ্য সাফল্যের মূলে ছিল কংগ্রেসের পিতৃ-স্থানীয় মতিলাল নেহরুর সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর, অনুপ্রেরণার উৎস গান্ধীজীর উপস্থিতি আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, রাজনীতিতে বিচক্ষণ যতীন্দ্রমোহনের নিরপেক্ষ বক্তৃতা। প্রত্যক্ষদর্শী অতুল্য ঘোষের (যিনি প্রতিনিধি ছিলেন এবং পরে প্রাক-স্বাধীনতা কংগ্রেসে বড় নেতা হয়েছিলেন) মতে "যতীন্দ্রমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বই ছিল দলের ওপর সংযমের বাঁধ।"*

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে যতীন্দ্রমোহন তাঁর বাংলা এবং বিশেষ ভাবে কলকাতাকে জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রধান এবং ঐতিহাসিক কেন্দ্র বলে আখ্যা দেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের উপর বিশেষ জোর দেন। সেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল অধিবেশনে বিচার্য 'নেহরু রিপোর্ট'। যতীন্দ্রমোহন বলেন "এটাকে আমি স্বাযত্তশাসনের ভিক্ষাপাত্র মনে করি না। এটা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে একটি অবশ্যম্ভাবী অস্ত্র। প্রস্তাবিত শাসনপ্রণালী আসল শক্তির পরিচয়, আমার মতে, তার পিছনে সমর্থন কাদের এবং কতখানি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের সামনে এমন কোন প্রস্তাব নেই যা এই নেহরু রিপোর্টের সমকক্ষ।" তিনি নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করার সুপারিশ করেন।

যতীন্দ্রমোহন বলেন "স্বায়ত্তশাসন আমাদের সাময়িক উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সীমিত সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনও পাওয়া কখনই সম্ভব নয় যদি না ব্রিটেনকে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয় যে সেটা না দিয়ে তাদের উপায় নেই আর সেই বোঝানোটা সহযোগিতা দিয়ে হবে না। সেটা বোঝাতে হবে তাদের এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে যে, যেভাবে তারা চলছেন সেটা আর কোনমতেই চলবে না। অবোধের মতন, তাদের কাছে আত্মসমর্পন করার ফলেই তারা আজ লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে 'সহযোগিতা' — আনুগত্যেরই নামান্তর মাত্র। সেটা দিয়ে আমাদের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই যখন

* কষ্ট-কল্পিত — অতুল্য ঘোষ। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা 6 অগাস্ট 1977।

হয়নি তখন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম সোপান হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের জন্যই আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।"

যতীন্দ্রমোহন আরও বলেন ঃ

> ভারত সন্তানদের স্বাধীনতা পেতে হবে দেশের মাটিতে। নিজেদের শক্তি আমাদের একীভূত করতে হবে, ব্যবধান ভুলতে হবে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এসবের জন্য অপরিহার্য হল আমাদের জাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্তন। নিজেদের প্রথমেই প্রশ্ন করতে হবে চীন, পারস্য, তুরস্কে আন্দোলন যদি সফল হয়ে থাকে তাহলে মহৎ মানুষদের মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের ক্ষুদ্র এবং বিরাট আন্দোলন কেন বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে? বর্তমান কালের, সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ আজ আমাদের মধ্যে। কেন তাহলে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল? আমাদের ভাবতেই হবে শ্রীঅরবিন্দ কেন নির্জন বাসে, চিত্তরঞ্জন কেন ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন, গান্ধীজী কেন তাঁর সবরমতি আশ্রমে — যখন কামাল পাশা, রেজা খাঁ আর চিয়াং কাই শেক স্বাধীন দেশের শীর্ষে বসে? এসবেরই উত্তর নিহিত আছে আমাদের জাতীয় ভুল ভ্রান্তির মধ্যে।
>
> আমাদের ব্যর্থতার মূলে আছে অতীত নিয়ে দাসত্ব মনোবৃত্তি। আমাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ, জাত, কূল, বিচার, পর্দা, বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি নানান জাতীয় কুষ্ঠ। আমরা জীবনটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে বাঁচি। আমাদের দেশপ্রেম বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য হল দুই বিপরীতের পাশাপাশি দাঁড়ানো, তার বেশি নয়। মধ্যযুগের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ পর্দাপ্রথার অন্ধকারে জীবনী শক্তি হারাই আর সেই সঙ্গে বাকি অর্ধেকের সর্বনাশ করি। জাত কূলের লড়াই দিয়ে আমরা জীবনটাকে ভেঙে চুরমার করি আর অর্ধেকের বেশি মানবজাতিকে অস্পৃশ্য মনে করি — যাদের ছায়াটুকু গায়ে পড়লে আমাদের জাত যায়। সেই আমরা কি কখনও পারব প্রয়োজনমত ব্রিটেনের ওপর চাপ দিতে? আধুনিক জগতের মানুষ হতে হলে আধুনিকতা বরণ করতেই হবে। আদিম যুগের তীর ধনুক নিয়ে আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করা চলে না। অস্ত্রের বেলায় যা প্রযোজ্য মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সমগ্র ভারতের মানবশক্তিকে নতুন আদর্শে গড়ে তুলতেই হবে।

শেষ করার আগে যতীন্দ্রমোহন বলেন, "আন্তরিক হন। পূর্ণ স্বাধীনতাই হোক সমগ্র দিনের চিন্তা, সমগ্র রাতের স্বপ্ন। একই জাতীয় পতাকার নিচে, সমগ্র ভারতের সন্তান, সাম্য এবং সখ্যতার সুর তুলে, স্বাধীন জাতির মুক্ত জীবনের দিকে চলুক, বিপদকে অবজ্ঞা করে, বিপর্যয়কে অগ্রাহ্য করে। শাসন ক্ষমতার নৃশংসতাকে তুচ্ছ করে।

"হতাশ হবেন না। সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে সঞ্চয় করুন। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যেটা তার সঙ্গে যুঝতে পারে। অজেয় সেই শক্তি নিয়ে সামনে চলুন, ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী সেই ভারতের দিকে যে ভারত শিল্পে অনন্য, বিজ্ঞানে উন্নত, জ্ঞানে অসীম, যে ভারত বিশ্ব সভ্যতাকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করবে, ভারত সাগরের মধ্যমণি হয়ে, সমগ্র পৃথিবীর সমূহ কৃষ্ণবর্ণ জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবীর যুদ্ধে দাবানল হয়ে।"

কানপুর কংগ্রেস

এর আগে, সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে, 1925 সালের ডিসেম্বরে কানপুর অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে যতীন্দ্রমোহন সরকারের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বেশ কড়া ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন যে স্বরাজ্য পার্টি এবং কংগ্রেসের কার্যকারিতায় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সরকারের ওটা গোপন ষড়যন্ত্র।

সুর্মা ভ্যালি অধিবেশন

বঙ্গ জনতার মূল্যবোধে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের প্রভাব এবং প্রসার স্বীকার করে তাঁকে সুর্মা ভ্যালি অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় (13 ফেব্রুয়ারী 1926)। এই সীমিত অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতা ছিল প্রগাঢ় শক্তিপূর্ণ। ভাষণের শেষে তিনি বলেছিলেন, "হয় মুক্তি না হয় মৃত্যু — এই মনোভাবের ভিত্তিতেই হবে স্বাধীন ভারতের জন্ম।"

কংগ্রেস সভাপতি (অস্থায়ী)

যতীন্দ্রমোহন যখন জেল থেকে মুক্তি পেলেন (আগেই বলা হয়েছে, ছাত্র সভায় নিষিদ্ধ বই পড়ার অপরাধে তাঁর ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল) আইন অমান্য আন্দোলন তখন চূড়ান্তে, সমগ্র ভারতের অধিকাংশ কংগ্রেস এবং কংগ্রেস কার্যকর কমিটি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে আর প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতা কারারুদ্ধ। কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলালও বন্দী।

কে তাহলে হবেন কংগ্রেসের সভাপতি? গান্ধীজী জেলে, সর্দার প্যাটেলও তাই আর স্বাস্থ্যের কারণে মতিলালেরও ইচ্ছে নেই সভাপতি হওয়ার। কাজেই, জওহরলাল নেহরুর পরামর্শ মত মতিলাল, যতীন্দ্রমোহনকেই করলেন অস্থায়ী সভাপতি।

বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এই গুরুদায়িত্ব নিলেন যখন তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। তবুও পত্নী নেলী সেনগুপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন উত্তর ভারত সফরে, গেলেন পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লখ্নৌ এবং সবশেষে অমৃতসর (অক্টোবর 21-25)। সভাপতি হওয়ার প্রায় পরদিন থেকেই ওঁর পথরোধ করার প্রচেষ্টা হল 144 ধারায়। তা সত্ত্বেও তিনি গেলেন কানপুর এবং স্থির করলেন আইন অমান্য করে জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু প্রবল বর্ষায় সভাই বসল না। বাধ্য হয়ে বিবৃতি দিলেন। গান্ধীজী এবং জওহরলালের নির্দেশে কংগ্রেস কার্যসূচী সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। সেইদিনই যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক পৌঁছালেন লখ্নৌ, সঙ্গে

সঙ্গে 144 ধারাও জারি হয়ে গেল। কিন্তু, ঘটনাচক্রে পুলিশ ওঁকে লখ্‌নৌ স্টেশনে ধরতেই পারলেন না।

জালিয়াঁওয়ালাবাগে গ্রেপ্তার

যতীন্দ্রমোহনের অমৃতসর সফর কিন্তু ঘটনাবহুল। বিনা নোটিশে পৌছান সত্ত্বেও বিরাট জনতা ওঁর অভ্যর্থনা করল স্টেশনে। এখানেও জারি হল 144 ধারা। ওঁরা ছিলেন ডাঃ কিচল্যুর বাড়িতে অতিথি। সমগ্র দিন গেল স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের বিরোধ মেটাতে। পরদিন, আইনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গেলেন পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত জালিয়াঁওয়ালাবাগে প্রায় 30,000 লোকের জনসভায় ভাষণ দিতে। পুলিশের মিছিল ওঁকে ঘিরে ফেলল আর ম্যাজিস্ট্রেট পড়ে শোনালেন 144 ধারার নিষেধাজ্ঞা। তা অগ্রাহ্য করে বক্তৃতা আরম্ভ করতেই পুলিশ ওঁকে গ্রেপ্তার করল আর জনতা হল প্রচণ্ড উত্তেজিত। সমগ্র শহর ক্ষুব্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে হরতাল। সেই হরতাল পালিত হল কলকাতায়, নাগপুরে এবং অন্যান্য শহরে। অমৃতসর পৌরসভার মিটিং বন্ধ হল তীব্র প্রতিবাদে আর দিল্লীতে হল শোভাযাত্রা।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরই অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন "এই ঐতিহাসিক শহরে গ্রেপ্তার হয়ে আমি খুব সুখী। ভারতীয় জাতির শীর্ষতম প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমি মনে করি,এইখানে গ্রেপ্তার হওয়া পরম গৌরব, বিশেষ করে পুণ্যতীর্থ জালিয়াঁওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত সভায়। এ সেই তীর্থভূমি যেখানে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখদের রক্ত এক হয়ে মিশে জাতীয়তার ঐক্যস্রোতে সমগ্র দেশকে ভাসিয়ে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছিল প্রত্যেক মানুষের মনে।"

ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় জেলে। নেলী সেনগুপ্তা ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসে জানালেন উনি 'অত্যন্ত আনন্দিত'। পরদিন ঐ জালিয়াঁওয়ালাবাগেই এক জনসভায় উনি দিলেন বক্তৃতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের। ওঁর স্বামীকে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার জন্য।

পরদিন নেলী সেনগুপ্তা গেলেন দিল্লী। যতীন্দ্রমোহনকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলে, বিচারের জন্য। অভিযোগ দুই প্রস্থ : ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্টের 124 এ ধারা অনুযায়ী 'রাজদ্রোহিতা' এবং ইনস্টিগেশন অর্ডিন্যান্সের 3 ধারায় জনসাধারণকে রাজদ্রোহিতায় উত্তেজিত করা।

শুনানীর শুরু থেকেই তাঁর স্বভাবমত আদালতের কার্যকলাপে যতীন্দ্রমোহন কোন অংশই নিলেন না। কিন্তু পুলিশ যখন ওঁর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল তখন প্রবল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে, প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, পুলিশসাহেব বক্তৃতার মর্ম ঠিক রাখলেও বক্তব্যের রীতিমত আদ্য-শ্রাদ্ধ করেছেন।

বিচারের প্রহসন চলল। যখন ম্যাজিস্ট্রেট মণ্ডলী ওঁকে বার বার প্রশ্ন করলেন

অভিযোগ সম্বন্ধে ওঁর কিছু বক্তব্য আছে কিনা, তখন উনি বললেন ঃ

> যদি বলা হয় যে ইংল্যাণ্ড ভারত শাসন করছে নিজের স্বার্থে তাহলে সেটা হয় রাজদ্রোহ — অথচ সুস্থ মস্তিষ্ক কোন মানুষ সেই সত্য কি অস্বীকার করতে পারে? যদি বলা হয় ভারতের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ করা উচিত সেটাকে বলা হয় রাজদ্রোহ। এই কথা বলার জন্য হাজারো লোক আপনাদের হাজতে। সরকারি চাকুরে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা গোপনে প্রার্থনা করে এবং মুখেও বলে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শেষ হোক। কোন ভারতীয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড় অনুভূতি আর কি হতে পারে যে ব্রিটিশ শাসন থেকে নির্মুক্ত হয়ে দেশ সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন হোক? আমি ভাল করেই জানি আপনারা আমাকে জেলে দেবেন — যেমন ভাবে ব্রিটিশ ক্ষমতার শক্তিতে আপনাদের মতন বহু ম্যাজিস্ট্রেট অসংখ্য ভারতীয়কে জেলে পাঠিয়েছেন এবং পাঠাচ্ছেন। আমি জেলে যাব এই পূর্ণ বিশ্বাসে যে এমন দিন শীঘ্রই আসছে যখন জেলের বাইরে যে সব মহৎ ভারত-সন্তান আছে, তারা সমবেত কণ্ঠে স্বাধীন ভারতের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রভুদের কাছে জানতে চাইবে কেন এবং কি অধিকারে তারা এই নিকৃষ্ট ভাবে দেড়শ' বছর রাজত্ব করেছে। আমার আর কিছু বলার নেই।

যখন ওঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হল যে প্রাসিয়া পার্কের বক্তৃতায় উনি বাংলার উদাহরণ দিয়ে দিল্লী এবং পাঞ্জাবের ছাত্রদের উত্তেজিত করেছেন এবং বলেছেন যে বাংলাদেশের ছাত্রদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা 'কর' দেওয়া বন্ধ করে আন্দোলনকে সফল করুন তখন যতীন্দ্রমোহন বলতে বাধ্য হলেন যে সরকারি বিবরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। ''আমার এটুকু বুদ্ধি নিশ্চয় আছে'' উনি বললেন ''যে ছাত্ররা আর যাই দিক না কেন'' কর ''কিছু দেয় না''।

এই মন্তব্যের পর যে সি আই ডি অফিসার ওঁর বক্তৃতার সারাংশ লিখেছিলেন তিনি মহা উৎসাহে আবার সেটা পড়ে শোনালেন — যার একটি প্রধান অংশ শুনে আদালত হেসে লুটোপুটি। তিনি লিখেছেন ''আমি বলছি কলকাতা আর বোম্বাইর গরীব গ্রামবাসী, যারা রাজনীতি বোঝে না তারা মনে কষ্ট পাচ্ছে, মনে মনে তারা গুলি খাচ্ছে, লাঠি খাচ্ছে।''

আদালত যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন 'কি বলতে চাইছেন আপনি?' সি আই ডি সাহেব চুপ করে রইলেন, যেন মোমের পুতুল। মুখে তাঁর আর কোন কথা জোগাল না। যতীন্দ্রমোহন তখন বলতে বাধ্য হলেন, ''কিছু বলার ইচ্ছা আমার ছিল না তবে স্বার্থের খাতিরে আমায় বলতেই হচ্ছে যে উনি যা লিখেছেন এবং পড়ে শোনালেন তা মূর্খের প্রলাপ। আমি কি বলেছিলাম বা বলিনি সে প্রশ্ন অবান্তর।''

পরদিন আদালত রায় দিলেন — এক বছর কারাদণ্ড।

করাচিতে দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের আমন্ত্রণ পেয়ে দেশপ্রিয় করাচি পৌছালেন 14

অক্টোবর 1930। মূর্তিটি উপহার দিয়েছিলেন করাচি পৌরসভার সভাপতি জামশেদ মেহেতা। কলকাতার মেয়র হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বহু প্রতিষ্ঠানের সংবর্ধনা পেলেন। ওঁর বক্তৃতার পর অনুষ্ঠানের সভাপতি তারাচাঁদ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যতীন্দ্রমোহনের ত্যাগ সাধনার এবং মানুষ হিসেবে তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্বের। তিনি এই আশাও ব্যক্ত করলেন যে ব্যক্তিগত ভাবে নয়, 1931 সালের করাচিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, সভাপতি হয়ে উনি আসবেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ইতিমধ্যে বহু প্রদেশের সংখ্যাগুরুত্বে যতীন্দ্রমোহনেরই সভাপতি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে ঐ সম্মান ওঁর নয়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য কারণ তিনি ওঁর চেয়ে প্রায় ছ' বছরের বড়। উনি নিজে পরে কখনও হবেন।

ভাগ্যের বিধানে সে সুযোগ আর হয়নি। 1933 সালে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

করাচি কংগ্রেস (1931)

স্বাস্থ্য তখন ওঁর একেবারেই ভাল ছিল না। রক্তের উচ্চচাপ ছিল এবং কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির দীর্ঘ বৈঠকের পর উনি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন নির্দিষ্ট ছিল জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবে এবং ওঁর সমর্থনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি নিয়ে বিতর্কিত প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠল ঠিক তিন মাস আগে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হওয়ায়। সেই নিয়ে চারিদিকে চাপা রাগ আর ক্ষোভের চাঞ্চল্য। তারই পূর্ণ বিবৃতি দিয়ে যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত সচিব বরদাপ্রসাদ নন্দী, বর্তমান লেখককে বলেছিলেন মাঝরাত্রে, সেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ইয়ুসুফ মেহের আলি ছুটে এলেন যতীন্দ্রমোহনকে সংবাদটা দিতে।

পরদিন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করে জওহরলাল যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার পূর্ণ সমর্থনে যতীন্দ্রমোহন যে বক্তৃতা দিলেন ঐ সংক্ষুদ্ধ পরিবেশে, তার ফলে সূত্রপাত হল প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের। তারই মধ্যে ঐ চুক্তির সার্থকতা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে ঐকান্তিক বিশ্বাসের সুর তুলে উনি বোঝালেন ঃ

> যুক্তি বা মিষ্ট ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন গান্ধীজীর প্রস্তাব নয়। ওঁর প্রস্তাব যা উনি সমগ্র পৃথিবীকে, প্রত্যক্ষ ভাবে, দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন — তা হল জনতার শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া! ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করলেই সেই সংগ্রাম অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের অনন্য অস্ত্র হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভারতজাতির সমবেত শক্তি। ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার কথা যে যাই বলে বলুক কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য উদ্দেশ্য হল, ব্রিটিশের সনাতনী প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, তাদের সাম্রাজ্যবাদিতা ইত্যাদি সব কিছুরই পরিসমাপ্তি। ... স্বপ্নেও মনে স্থান দেবেন না যে এই চুক্তি অনুযায়ী মহাত্মাজী চাইছেন যে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে বসতে বাধ্য। কখনই তা নয়। ...

আপনারা ভাল করেই জানেন যে আজ এবং প্রস্তাবিত বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে, একটি নয়, এমন অনেক কিছুই ঘটতে পারে যা কংগ্রেসের পক্ষে ঐ বৈঠকে যোগদানের পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে। ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা কংগ্রেসকর্মীরা সন্ধিশর্তে চুক্তিবদ্ধ। আর, যদি দেখি যে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি তাহলে সেটা হবে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রথম চুক্তিভঙ্গের অপরাধ। চুক্তির অন্যান্য শর্ত যদি ভঙ্গ হয় যেমন, নুন তৈরির ব্যাপারে বা বিদেশী বস্ত্র বর্জনে, তাহলে রাস্তা আমাদের খোলা রইল বৈঠকে না যাওয়ার। তখন আমাদের দায়িত্ব হবে স্পষ্ট ভাষায় সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া যে ব্রিটিশ সরকার চুক্তিভঙ্গ করেছে বলেই আমরা বৈঠকে বসতে অপারগ। ...

মনে রাখবেন যে অধুনা ভারতের ইতিহাসে এমন কখনও ঘটেনি যখন ভারতের উদ্ধত ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জাতির অনন্য প্রতিনিধির সঙ্গে সমান আসনে বসে চুক্তির জন্য সাধ্য সাধনা করেছে — যেমন ওরা করেছে গান্ধীজীর সঙ্গে। অধুনা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ঐ ক্ষীণাঙ্গ মানুষটির ক্ষমতা আমাদের জাতির ক্ষমতা — ভারত সরকার প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করল। ওরা চুক্তি করতে অগ্রণী এবং অধৈর্য হয়েছিল কারণ বুঝেছিল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে আছে পুরো জাতির ক্ষমতা। আপনাদের বক্তব্য হোক যে আমরা চুক্তি ভাঙিনি। আমরা, কংগ্রেস কর্মীরা মহত্তম মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধির নেতৃত্বে ভারতীয় জাতির সততা এবং সম্মানের সাম্যভাব কোন ভাবে ব্যহত করিনি।

কেরালা অধিবেশন

করাচি অধিবেশনে বক্তৃতার পরই যতীন্দ্রমোহন দেশের প্রথম শ্রেণীর নেতা রূপে পরিচিত হলেন। তার অল্পদিনের মধ্যেই 3 মে 1931 তিনি কেরালা গেলেন বাদগরায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতি হওয়ার আমন্ত্রণে। বক্তৃতায় গান্ধী-আরউইন চুক্তির তাৎপর্য বিশদ ভাবে আলোচনা করে তিনি বললেন ঃ

আসলে সবাই আমরা জানি এই চুক্তি হল দু'পক্ষেরই বিরোধিতা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য। অতএব এই সময়টা শক্তির নয় সন্ধির। পরোক্ষভাবে এই সন্ধির কিছুটা অর্থ হল — যদি এর শর্ত প্রতিপালিত না হয় অথবা দেখা যায় যে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না তাহলে কংগ্রেসের অধিকার থাকবে, যেমন থাকবে সরকারের, আবার সংগ্রাম শুরু করার। গান্ধীজী তো বলেইছেন "হয় কয়েক মাসের মধ্যে আমরা পাব পূর্ণ স্বাধীনতা আর না হয় আমি ও সর্দার প্যাটেল যাব কারাবাসে।" জয়লাভ এখনও হয়নি। উদ্দেশ্য এখনও সফল হয়নি। শান্তি এখনও আসেনি। সংগ্রাম আবার শুরু হবে কি না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আগামী গোলটেবিলের ফলাফলের ওপর।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে চুক্তিতে এমন কিছুই নেই যা কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর অন্তরায়। আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্রিটিশের সঙ্গে সংযুক্তভাবে অথবা পৃথক ভাবে থাকতে পারে। এর কোনটা ভাল সে বিচারের ভার জাতিগত ভাবে তাদের এবং আমাদের। কিন্তু, তার বেশিটাই নির্ভর করবে ব্রিটিশ জাতির মনোভাবের ওপর। আমাদের সহজাত অধিকার হল স্বদেশী শাসনতন্ত্র এবং বৈদেশিক ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের আয়ত্বাধীনে রাখার রাজনৈতিক ক্ষমতা। এ ছাড়া অন্য কিছু বা এর কম কিছু পেলে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হবে না, দেশ সন্তুষ্ট হবে না। রাজনীতিক সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাপারে কোন আপস কিছুতেই চলবে না।

অসাধারণ রেঙ্গুন বিচার

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক গেলেন সিঙ্গাপুর ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল 1930। যাওয়ার পথে জাহাজ যখন রেঙ্গুন পৌঁছাল (3 ফেব্রুয়ারী) বর্মাবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বর্মার এক মস্ত ব্যবসাদার আবদুল বারি চৌধুরী ওঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন ফেরার পথে রেঙ্গুনে নেমে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বর্মাকে ভারত থেকে পৃথক করার প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থজাত প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে, প্রয়োজনমত উপদেশ দিতে। বর্মাকে আলাদা করে দিলে যে সব ভারতীয়েরা বংশানুক্রমিক ভাবে বর্মায় বসবাস করছেন তাঁদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। তাছাড়া, এই দুই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যাবে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রাম ও দেশেও কিছু কম প্রভাব বিস্তার করেনি।

ফেরার পথে যতীন্দ্রমোহন বক্তৃতা দিলেন বিরাট জনসভায় আর সরকার সেটাকে আপত্তিজনক ঘোষণা করে ওঁকে অভিযুক্ত করলেন রাজদ্রোহিতার অপরাধে।

রাজদ্রোহিতার অভিযোগে রেঙ্গুনে যতীন্দ্রমোহনের বিচার শুধু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামেরই নয়, যে কোন দেশের ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনা। রেঙ্গুনের এই প্রহসন বর্মার তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজের প্রাদেশিক শাসক তাঁর সাম্রাজ্যবাদী অহংকারে ক্ষুণ্ণ হয়ে, পিছন থেকে দড়ি টানলেন পুলিশ কমিশনার মেরিকিনকে সামনে রেখে। বিচারক আই সি এস মরিস কলিন্স বললেন যতীন্দ্রমোহন না কি তাঁর বক্তৃতায় 'স্যার চার্লস ইনেসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কড়া কথা ব্যবহার করেছেন।' তিনি আরও বলেন যে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কলকাতার মতন মহানগরের স্বনামধন্য মেয়রকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে শাস্তিবিধান — এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার। এটা করা যেত না যদি না 'উনি অত্যন্ত অপরাধজনক বক্তৃতা দিতেন।' অতএব সরকারের নির্দেশানুযায়ী মেরিকিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করলেন 16 মার্চ আর সেটা সই করলেন কলিস।

তখনকার দিনে যতীন্দ্রমোহনের মতন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করা বা তাঁকে শাস্তি দেওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল না কিন্তু এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে বিবেকী ম্যাজিস্ট্রেটের এই কর্তব্যনিষ্ঠায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গেলেন ক্ষেপে। যদি কোন স্বাধীন দেশের এই মানের স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রতি অন্য কোন দেশে এই ধরনের আইন ব্যবহার করা হত তাহলে আন্তর্জাতিক আলোড়নে এঁদের পায়ের তলার মাটি খসে যেত।

কলিস বিপাকে পড়ে কিছু সময় নিলেন ভাববার। রেঙ্গুনে তাঁরই আদালতে হবে যতীন্দ্রমোহনের বিচার আর চাঞ্চল্যের থাকবে না কোন সীমা। 'ইনি এক প্রখ্যাত ব্যক্তি

যাঁকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্যার চার্লস অথচ বিচারের ভার আমার ওপর!' ভাবতে লাগলেন কি করে যতীন্দ্রমোহনের গ্রেপ্তার 'শাস্তিবিধান করে অন্ততঃ কিছুটা যুক্তিপূর্ণ করা যায়। মামলা যদি অমূলক হয় আর শাস্তি দিতে আমি অক্ষম হই তাহলে জনসাধারণের নিন্দায় সরকার হবে নাস্তানাবুদ। সভয়ে আমার মনে পড়ল যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল শাস্তির পক্ষে কেসটা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। হ্যজেসের কেসের ঠিক পরেই এত বিচিত্র একটা রাজকীয় কেস সামলাবার মতন মানসিক শক্তি আমার খুব ছিল না। অথচ এটা এড়িয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই। কেসটা হাতে নিতেই হবে ..." ।*

এরপর কলিস সাহেব ভারতীয় দণ্ডবিধির 124-A ধারা অনুশীলন করেন যাতে আছে রাজদ্রোহিতার ব্যাপক ব্যাখ্যা। সাধারণ বিশ্বাসে এই ধারার খসড়া করেছিলেন প্রসিদ্ধ আইনবিদ মেকলে। এটা এক আজব ধারা। লেখা, কথা বা কাজ তো দূরের ব্যাপার, এই ধারানুযায়ী চোখের পাতা ফেললেও সেটা রাজদ্রোহিতা বলে গণ্য হতে পারে। এটা এমনই ভয়ংকর যে বিধানসভায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "প্রত্যেক ভারতীয়ের অপরিহার্য কর্তব্য এই শাসনতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা এবং সরকারের বিরুদ্ধে সেই ঘৃণা প্রচার করা।"

'... যত ভাবলাম ভবিষ্যতের কথা তত বাড়ল আমার ভয় আর ভাবনা, মাঝে মাঝেই আমার মনে হতে লাগল যে যুক্তি আমাদের এমনই দুর্বল যে আইনত সেটা সামলানো যাবে কিনা সন্দেহ। অথচ ভেবেই পেলাম না কি-ই বা আমি করতে পারি ...।'

কলিস্ মন খুলে কথা বললেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ফ্র্যাংক হুইটিংস্টলের সঙ্গে। "বলুন তো লাটসাহেব কেন এই অভিযোগের আদেশ দিলেন? আসল ব্যাপারটা কি?" ফ্র্যাংক উত্তর দিলেন, "উনি চাননি কোন আন্দোলনকারী ভারতীয় বর্মার ব্যাপারে মাথা ঘামায়। শুধু তাই নয়, উনি চান না ভারতীয় গণ্ডগোলে বর্মা জড়িয়ে পড়ুক। সি আই ডি রিপোর্ট যখন পেলেন, মনে করলেন যতীন্দ্রমোহনের মতন বাইরের লোক এসে বর্মীদের মাথায় কুবুদ্ধি দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করার পক্ষে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।"

যতীন্দ্রমোহনের গ্রেপ্তারে কলকাতায় চাঞ্চল্য

যতীন্দ্রমোহন রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন যখন 11 মার্চ (1930) ওঁর এলগিন রোডের বাড়িতে কলকাতা পুলিশ প্রধানের সঙ্গে রেঙ্গুন পুলিশ এল রেঙ্গুনে 20/21 ফেব্রুয়ারী ওঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে। তিনি নাকি তাঁর বক্তৃতায়

* মরিস কলিসের লেখা 'ট্রায়াল ইন বর্মা" — পেঙ্গুইন বুকস্। উনি অক্সফোর্ডে বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন ইতিহাসের। 1911 সালে আই সি এস হওয়ার পর 22 বছর চাকরি করেন বর্মায় (1912-34)। তারপর সাহিত্যিক হিসেবে নাম কেনেন প্রচুর।

'রাজদ্রোহ' কথাটা বার বার ব্যবহার করেছেন। দুটো পাঁচ হাজার টাকার বন্ধকীতে ওঁকে জামিন দেওয়ার প্রস্তাব হল। উনি 'না' বলে দিলেন। এ কথা পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোনে জানাতেই তিনি কিছু ইতস্তত করলেন কারণ আসামী হলেন স্বয়ং কলকাতার মেয়র। ঠিক করলেন ওঁকে গৃহ-বন্দী করা হোক বাড়ির সামনে দিন রাত পুলিশ পাহারা বসিয়ে।

সংবাদটা প্রকাশ হওয়া মাত্র শহরময় শুরু হল প্রবল চাঞ্চল্য, পরদিন ওঁকে গ্রেপ্তার করে রেঙ্গুন নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে ঘোষিত হল 'হরতাল'।

পরদিন ভোরবেলা থেকেই দলে দলে লোক জড়ো হল আউটরাম ঘাটে যেখানে মেয়রকে তোলা হবে 'সিরধন' জাহাজে রেঙ্গুনের পথে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং অমল হোম (ক্যালকাটা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট - সম্পাদক) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নাগরিক সেনগুপ্ত দম্পতির সঙ্গে গেলেন জাহাজ পর্যন্ত। কিন্তু দুর্বিনীত ব্যবহারে, এই নিতান্ত বিপদাপন্ন যাত্রায়, নেলী সেনগুপ্তাকে যেতে দেওয়া হল না তাঁর অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে। কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু যতীন্দ্রমোহনকে পরালেন বিদায়ী মালা এবং জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনুরাগীরা পরিয়ে দিলেন তিলক।

জাহাজ যাত্রা শুরু করল গগনভেদী জয়ধ্বনির মধ্যে।

কর্পোরেশনের প্রতিবাদ

মেয়রকে গ্রেপ্তার করার তীব্র প্রতিবাদে কর্পোরেশন বেশ কড়া ভাষায় প্রস্তাব গ্রহণ করল। কাউন্সিলররা সর্বসম্মত প্রস্তাব করলেন "মেয়র এবং কলকাতার প্রথমতম নাগরিক আর সর্বসাধারণের পরমশ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহনকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তারের জন্য গভীরতম ক্ষোভে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।" প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে "বর্মা সরকারের এই অপকীর্তি সম্পূর্ণ ভাবে অযৌক্তিক এবং সাধারণ মতবাদ প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতায় অহেতুক হস্তক্ষেপ করে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূলে আঘাত করার প্রয়াসে হীনতম ষড়যন্ত্র।"

রেঙ্গুনে বিচার

যতীন্দ্রমোহন রেঙ্গুন পৌছলেন 17 মার্চ সকালে। জাহাজে ঘাটে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন রেঙ্গুনবাসী ভারতীয়, বহু বিশিষ্ট বর্মী নাগরিক, মহিলাবৃন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পুলিশ সুপার ফিপ্স তাঁকে নিয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি। প্রতীক্ষারত পুলিশ কমিশনার মেরিকেন এবং কলিসের কাছে। আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্তকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার পর চায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনকে প্রস্তাব দেওয়া হল নামমাত্র টাকায় জামিন দেওয়ার। সত্যাগ্রহী হিসেবে উনি সহাস্যে দুটোই বাতিল করে দিয়ে বললেন, "বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও তো আমি পাব

না।" ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল জেলে এবং বিচারের সময় ধার্য করা হল ঐ দিনই বেলা এগারোটা।

বিচার হল নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে, জনতা গভীর ভাবে উত্তেজিত। তারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট শুনানী চালিয়ে গেলেন অপ্রতিহত। বন্ধু 'সেনের' কাছ থেকে কাগজ নিয়ে যতীন্দ্রমোহন নির্বিকার চিত্তে মন দিলেন কাগজের পাতায় আর মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে মন্তব্য করলেন সংবাদের ওপর। "উনি নিজের কাজ করছিলেন আর আমি সেটা বেশ উপভোগ করছিলাম" কলিস পরে লিখলেন, "ওঁর ব্যাপারে আমি কি করছি মানুষ হিসেবে ওঁর কিছু কৌতূহল থাকলেও, জেল যাওয়া যে-দলের জল-ভাত তাদের নেতা হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কার্যকলাপ তাঁর কাছে অবশ্যই নিন্দনীয়।"

কলিসের বেশ চিন্তা হল "ওঁর মতে, অভিযোগ এমনই বীভৎস ভাবে যুক্তিহীন যে বড় ধরনের শাস্তি দিলে উনি শহীদ হয়ে যাবেন। ব্যক্তিগত ভাবে জেল যাওয়ায় যতই আপত্তি থাক, নেতা হিসেবে এমনই নির্ভীক এবং নিবেদিত যে জেলটা যেন কিছুই নয়। মানুষটা তাই একযোগে উত্তেজিত অথচ নির্বিকার। সকলের সজাগ দৃষ্টি কিন্তু ছিল ওঁরই ওপর। কোর্টের মধ্যে ছিল অর্ধেক এশিয়ার সাংবাদিক। বাইরে বিরাট জনতা গলা ফাটাচ্ছিল ওঁর সমর্থনে। উনি কিন্তু সতর্ক। মনোভাবের সামান্য ইশারাও যেন কেউ না পায়। একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই ওঁর সত্যটা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল।"

"পরের দু'দিন চলল আসামী পক্ষের সাক্ষ্য এবং সরকার পক্ষ সমর্থন। পাছে উত্তেজিত জনতা দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়, সেই ভয়ে চারিদিকে পুলিশের পাহারা এবং সৈন্যও মোতায়েন।

তারপরই রায়দান স্থগিত।

"সকলেরই খুব আগ্রহ ছিল জানার আমি কি রায় দি। আর যতীন্দ্রমোহনকে যদি বেকসুর খালাস করে দি তাহলে সরকার আমায় কি করবে" লিখেছেন কলিস্।

পরদিন কলিস্ রায় দিলেন প্রায় আধঘণ্টা ধরে। শাস্তি হল বিনাশ্রমে দশ দিন কারাবাস। রায় শুনে যতীন্দ্রমোহন মুচকি হাসলেন। 'এইটাই হল ইশারা' কলিস ভাবলেন, 'সমগ্র জাতীয় পত্রিকাদের যেন বলা হল হাসতে। কেসে শহীদ কেউ হল না ঠিকই কিন্তু উপাদান যথেষ্ট আছে সরকারকে বিদ্রূপ করার। সরকারকে না হোক আমলাদের তো বটেই। আর ব্রিটিশ শাসনে, বিচারের প্রহসনটা যখন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে করানো হল, তখন ব্রিটিশ জাতটাই বা বাদ পড়বে কেন ঐ বিদ্রূপ থেকে? ও কথা যত কম ভাবা যায় ততই ভাল ...।'

সর্ব-ভারতীয় হট্টগোল

বেশ কিছু উত্তেজনা দেখা গেল 31 মার্চ দিল্লীর বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরের সময়।

স্বরাষ্ট্র সদস্য হেগকে (পরে 'স্যার' হয়েছিলেন) প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করলেন কে এস মুনসি এবং অন্যান্য রাজনীতিক সভ্য যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মালব্যজী। ওঁরা জানতে চাইলেন যতীন্দ্রমোহনকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জবাব ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, যেমন —

"গত 25 জানুয়ারী ভাইসরয় বলেছিলেন রাজদ্রোহিতার অপরাধ তখনই গণ্য হবে যখন হিংসানীতি অবলম্বনে আগ্রহ প্রকাশ হবে অথবা যখন আইন এবং সরকারের শাসন ক্ষমতা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে আন্দোলন প্রসঙ্গে বক্তৃতা হবে। বলবেন কি, ভারত সরকারের মতও কি তাই?"

"হ্যাঁ।"

"যতীন্দ্রমোহনের বক্তৃতাও কি তাই ছিল?"

"হ্যাঁ।"

অবশেষে গয়াপ্রসাদ সিং প্রশ্ন করলেন "মহামান্য মেম্বর কি বুঝতে পেরেছেন যে ভারত এবং বর্মা সরকার মিলিত ভাবে জনতার কাছে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন?" এরপরই সভাপতি ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিলেন, থামবার আদেশ জারি করে।

লিবারল নেতা পণ্ডিত কুঞ্জরু (মৃত্যু এপ্রিল 1978) মন্তব্য করলেন যে ব্রিটিশ আইনকে ঘৃণার চোখে দেখার পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত অল্পই আছে। রাজা গজনফর আলি বললেন "যে ভাবে যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে যে সব প্রমাণ দেওয়া হল তাতে পুরো ব্যাপারটাকে একটা কৌতুক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।" এমন কি লবণ আইন ভাঙার ব্যবস্থায় ভীষণ ব্যস্ত গান্ধীজীও তাঁর পত্রিকা 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় লিখলেন যে উনি যদি কোন স্বাধীন দেশের মানুষ হতেন তাহলে যতীন্দ্রমোহনকে মুক্তি দিয়ে সরকারকে শাসন করতেন কেস চালু করার ছ্যাবলামোর জন্য। গান্ধীজী আরও লিখলেন "অসন্তোষ যদি অপরাধ হয় আর 124-A ধারাই যদি বাস্তবতার আভাষ মাত্র থাকে তাহলে রাজদ্রোহিতাকে ধর্মে পরিণত করার জন্য বহুদিন আগেই আমার গুরুতর সাজা হওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। কিন্তু, সরকার ভয় পান পৃথিবীর মতবাদকে। অহিংস বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত এবং অচিরে তার বিজয় অবধারিত।"

রেঙ্গুন পর্বের পরিসমাপ্তি

রেঙ্গুনে কারাবাসের চতুর্থ দিন, তাঁর সুখ সাচ্ছন্দ্যের তদারক করতে কলিস গেলেন জেলে। যতীন্দ্রমোহনের সেটা ভালই লাগল। অষ্টম দিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল এবং পরদিনই তিনি নিমন্ত্রিত হলেন আর এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে। ভাষণ তিনি একই ধারায় দিলেন কিন্তু ভাষা ছিল অত্যন্ত সংযত।

পরে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য যতীন্দ্রমোহন গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট কলিসের

বাড়ি। কলিস তাঁকে পরম সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর মতে, "আমার অতিথি ছিলেন বেশ উৎফুল্ল।"

"যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল", যতীন্দ্রমোহন হাসতে হাসতে বললেন "আপনি চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন, আমি খাইনি — মনে আছে নিশ্চয় — আজ কি এক গ্লাস বার্লিজল চাইতে পারি?" অন্তরঙ্গ ভাবে দুজনে বেশ কিছুক্ষণ আলাপের পর যতীন্দ্রমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভোরবেলাই আমি কলকাতা রওনা হব আর পৌঁছেই পড়ব আবার সেই সংগ্রামের ঝড়ে। আর হয়তো আপনার সঙ্গে কখনও দেখাই হবে না।"

"আপনি অত্যন্ত উদার", কলিস বললেন, "আর এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এটা মনে রাখার জন্য সামান্য একটা প্রতীক দিলে, আপনি কি নেবেন?" উনি সাদা পীলু পাথরের খোদাই করা এক সিংহ — যার লেজের শেষটা পদ্মের আকার ধারণ করেছে — ওঁকে দিলেন। সেটা বুকপকেটে রেখে যতীন্দ্রমোহন বললেন "এবার যেতে হবে। রাতের চাকা বন বন করে অনবরত ঘুরছে। এই আনুষ্ঠানিক প্রহসন এবার তাহলে শেষ করা যাক। আবার কোন শুভ মুহূর্তে, হয়তো ..."

বাংলা রাজনীতির সন্ধিক্ষণ

1925 সালে মেয়র নির্বাচনের সময় বাংলার রাজনীতিতে যে মনোমালিন্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা প্রায় দশকের শেষেও বিন্দুমাত্র কমেনি। বস্তুত কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক অধিবেশনের সময় (1926) সেটা বেশ প্রকটই হয়ে উঠেছিল। তারপরই ডাকা হল কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির মিটিং। অধিবেশনটা ছিল সভাপতি, বিভিন্ন প্রতিনিধি, প্রাদেশিক নেতৃবর্গ এবং সাধারণ সভ্যদের মতবিরোধের প্রধান কেন্দ্র। দেখা গেল তিনটি দল — একটি সভাপতি যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে, একটি বিপক্ষে এবং ললিতমোহন দাসের নেতৃত্বে ছোট্ট একটা দল যাঁরা প্রায় সকলেই নিরপেক্ষ। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কিছু কমিটি ছিল যাতে বিপক্ষীয় দল ক্রমেই নিজেদের প্রাধান্য এবং প্রভাব বাড়িয়ে তুলছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচজন প্রভাবশালী নেতার পিছনে — বিধান রায়, তুলসী গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনী রঞ্জন সরকার এবং শরৎচন্দ্র বসু। "পঞ্চ নেতা" নামে পরিচিত এঁরা বাংলা কংগ্রেসের কাজে অবহেলা এবং অন্যান্য ভুল ভ্রান্তির উল্লেখ করে কাগজে এক বিবৃতি দিলেন সভাপতি যতীন্দ্রমোহনের বিপক্ষে। শান্ত প্রকৃতির সহজ মানুষ যতীন্দ্রমোহন তার কোন প্রতিবাদ করলেন না, শুধু ছোট্ট একটা বিবৃতিতে ভুল ভ্রান্তিগুলো খণ্ডন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিভেদ বেশ প্রকট ও জটিল হয়ে উঠল।

এই সময় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মিটিং হল কলকাতায়। অন্যতম প্রধান নেতা সরোজিনী নাইডু চেষ্টা করলেন ওঁদের বিরোধ মেটাবার এবং যতীন্দ্রমোহন

আর তুলসী গোস্বামী এক সংযুক্ত বিবৃতিতে জানিয়ে দিলেন যে ওঁদের সব বিরোধ মিটে গেছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তখন আবার নতুন করে পুনর্গঠিত হল কিন্তু পঞ্চনেতার চারজন সেই কমিটিতে যোগদানে অস্বীকৃত হলেন। ফলে বঙ্গীয় রাজনৈতিক চত্বরে হতাশার ছায়া পড়ল এবং "দি ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক পি কে চক্রবর্তী রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখ করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন (1925-26) 'বেআইনী বাহক'। জানা গেল যে 'পঞ্চ নেতার' এক বড় পাণ্ডা, কাগজের ওপর যাঁর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল — রাতারাতি প্রেসে যাওয়ার পর সেটা চেপে দিলেন। শুধু তাই নয়, সেই কারণে প্রবীণ সম্পাদক সসম্মানে পদত্যাগ করলেন। পরে, অন্যান্য কাগজে তাঁর ধারালো কলম ধরলেন যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে। এইসব ঘটনার পূর্বে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি ছিল যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে, এবার সেটা গেল বিপক্ষে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই সব দলাদলির ছায়া পড়ল চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের ওপর — যেটা এতদিন পর্যন্ত ছিল সভাপতি যতীন্দ্রমোহনের আওতায়। অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ থেকেই, বস্তুত উনিই ছিলেন ঐ জেলা (নিজের) কংগ্রেসের কার্যসূচীর নেতা। এবার আরম্ভ হল ক্ষমতার লড়াই এবং যে কোন কারণেই হোক কলকাতার প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহন হেরে গেলেন। ফলে দু'জায়গাতেই চাঞ্চল্য বেশ গভীর হল এবং যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন — যেটা পরে অবশ্য প্রত্যাহার করতে ওঁকে রাজি করানো হল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলাদলি আরও খারাপের দিকে গেল 1928 সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের পর। এটাই হল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে প্রবল বাক বিতণ্ডা এবং রাগারাগির মূল কারণ — যেটা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে।* যতীন্দ্রমোহন এবং সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ আরও প্রবল হল পরে, বিধানসভা যোগদান প্রসঙ্গে।

অ্যাডভান্স পত্রিকার আত্মপ্রকাশ

মোটামুটি এই সময়ে কলকাতার দৈনিক পত্র 'লিবার্টি' (যেটা আগে ছিল 'দি ফরওয়ার্ড') নিয়মিত ভাবে আরম্ভ করলেন সব ব্যাপারেই যতীন্দ্রমোহনের সমালোচনা। ফলে তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন নিজস্ব একটি পত্রিকার এবং ডিসেম্বর 1929 প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন 'অ্যাডভান্স' দৈনিক পত্রের। উনি নিজে হলেন প্রধান সম্পাদক এবং পি কে চক্রবর্তী নিযুক্ত হলেন সাধারণ সম্পাদক আর সবে বিলেত থেকে প্রত্যাগত ওঁর ছোট ভাই রণেন সেনগুপ্ত নিলেন ব্যবস্থাপনার

---

* "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস" — ড. পি সীতারামিয়া; পৃঃ 360।

সমস্ত দায়িত্ব। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বিতরিত হল লাহোর অধিবেশনের ক্যাম্পে এবং সভাস্থলে। জাতীয় সভায় পত্রিকাটি পেল যথেষ্ট সুনাম এবং সম্মান।

বাংলা কংগ্রেসে শান্তি এবং সুব্যবস্থা আনার ব্যাপারে হাই কমাণ্ডের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। এক সময়, এই ব্যাপারে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি মতিলালজীকে রাজি করিয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেসের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে। সে প্রচেষ্টায় অনেক রকম বাধা বিপত্তির উদ্রেক হওয়ায় ভার পড়ল ড. এম এস অ্যানের ওপর। কিন্তু ঠিক সেই সময় আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে (1930-32) সমগ্র দেশময় দেখা দিল প্রবল আলোড়ন। অ্যানে একটা রিপোর্ট নাকি তৈরিও করেছিলেন কিন্তু সমসাময়িক উত্তেজনায় সেটা সম্ভবতঃ মুলতুবী রাখা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও দেখা গেল বাংলার দুই সন্ত্রাসবাদী দল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠির যে কোন একটাকে সমর্থন করছেন — যেমন 'অনুশীলন সমিতি'র কিছু বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে আবার ওদিকে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী বেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। তখনকার বাংলা কংগ্রেসের দলাদলির এটা বেশ বৈশিষ্ট্যমূলক দৃষ্টান্ত। যখন লাহোর অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের সময় হল (1929) তখন দেখা গেল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত হলেন এবং যুগান্তর গোষ্ঠীর বিশিষ্ট সভ্যদের সাহায্যে বেশি ভোট পেয়ে জিতেও গেলেন, দ্বিতীয় নাম গেল মার্কিনী নাগরিক তারকনাথ দাসের। অন্য দল যখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, কলকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সর্বতোভাবে উপযুক্ত, জনপ্রিয় নেতা যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রস্তাব করলেন তখন সভায় উঠল মৃদু গুঞ্জন। কাগজে কাগজে বিপক্ষ দলের বিস্তারিত প্রচার এবং দালালি আরম্ভ হল যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রত্যাহার করার জন্য। পরে অবশ্য পাঁচ ভোটে ওঁর নামোল্লেখের প্রস্তাব পরাজিত হল।

যাই হোক, সর্ব-ভারতীয় প্রস্তাবানুযায়ী শেষ পর্যন্ত লাহোর অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

ভাবতেও অবাক লাগে কি গভীর ভাবে এই বিরোধ ছড়িয়েছিল। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 1929 সালে (ঢাকা জেলার) মুনসীগঞ্জে হরিজনদের 'মন্দিরে প্রবেশাধিকার' সত্যাগ্রহ। জনপ্রিয় নেতা হিসেবে যতীন্দ্রমোহন সত্যাগ্রহকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করলেন। স্থানীয় উকিলদের (বেশির ভাগই গোঁড়া হিন্দু) নেতৃত্বে সনাতনপন্থী হিন্দুরা দাঁড়ালেন ঐ সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে। তাঁদের আরও উত্তেজিত করলেন, চাপা গলায় কিছু কংগ্রেস নেতা — গোপন পরামর্শ দিয়ে। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল যতীন্দ্রমোহনকে জব্দ করা। তিনি কিন্তু তাঁর চারিত্রিক ধৈর্য এবং উদারনৈতিক মূল্যবোধে, হরিজন প্রাসঙ্গিক কংগ্রেস নীতি অনুযায়ী চাইলেন সমস্যার

সমাধান। এদিকে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কিছু করতে নারাজ। যাই হোক, দেশপ্রিয়র উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় স্থানীয় লোকেরা রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে সত্যাগ্রহ চালিয়ে, হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেলেন।* পুরান ঘায়ে নুনের ছিটে না দিয়ে, বলা চলে যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলির অবসান হতে বহু বছর লেগে গেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারা বদল হল। যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা বেশ ভাল ভাবেই জানতেন দোষ কার এবং কে ন্যায়ের পথে চলছে। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের ভাষায় (যিনি স্মৃতিচারণ করেছেন 'দেশ' পত্রিকায় 1977-78) "প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অবিচলিত। এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ।" এ কথা তিনি লিখেছেন 'পঞ্চ নেতা' বনাম যতীন্দ্রমোহনের প্রসঙ্গে।

চট্টগ্রামের দৌরাত্ম্য

অবিভক্ত ভারতে, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম ছিল বহু গম্ভীর অথচ গৌরবময় ঘটনার কেন্দ্রস্থল। তার বহু ঘটনা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। ইন্সপেক্টর আসানুল্লা হত্যার পর (আগস্ট-সেপ্টেম্বর 1931) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের নীরব সম্মতি এবং গোপন সাহায্যে চট্টগ্রামে রক্তের প্লাবনে যে অমানুষিক নৃশংসতা এবং বিশৃঙ্খলতা ঘটেছিল তা বর্ণনাতীত ভাবে মর্মান্তিক। এর মূলে ছিল — চট্টগ্রামের যুব সমাজ — যাদের চট্টগ্রাম বিপ্লবের সাফল্য (1930-35) আজও ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভাবে অমর হয়ে আছে — তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের গোপন ষড়যন্ত্র। নিরপরাধ মানুষদের ওপর যে অমানুষিক ভাবে নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল তা ভাবলেও যে কোন সভ্য মানুষের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়।

ঐ সর্বনাশা দিনের শুরু 30 আগস্ট 1931।

'নিজাম পলটন' নামীয় ময়দানে ফুটবল ফাইন্যাল সবে শেষ হয়েছে। বিজয়ী টাউন ক্লাবের (অধিকাংশ সভ্য পুলিশবাহিনীর লোক) সভাপতি, ঝানু পুলিশ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্লা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। কাপ দিয়ে দেওয়া হল। শহরের বহু বিশিষ্ট সরকারি এবং বে-সরকারি নাগরিক এবং বেশ কিছু ইউরোপীয় এদিক ওদিক ছড়িয়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং তৎরপরবর্তী বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংকটময় এবং সন্দেহজনক ছিল বলে চারিদিকে

* এ তথ্য পাওয়া গেছে দীর্ঘকাল আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য এন সি ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা "সত্যাগ্রহ ইন বেঙ্গল 1921-1233" বইতেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

পুলিশের কড়া পাহারা, জায়গায় জায়গায় সৈন্যও বন্দুক নিয়ে তৈরি। খান বাহাদুর সানন্দে সকলের সংবর্ধনা নিচ্ছিলেনে এমন সময় হঠাৎ পিস্তলের শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরাশায়ী। বিজয়ের অসীম আনন্দধ্বনি ভেদ করে উঠল আতঙ্কের গভীর আর্তনাদ। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ আততায়ীকে গ্রেপ্তার করল।

চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেটির নাম হরিপদ ভট্টাচার্য। হাতে তার দুটো রিভলবার। গ্রেপ্তারের মুহূর্ত থেকেই আরম্ভ হল তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। তাকে নিয়ে যাওয়া হল সদর থানায় টানতে টানতে। ষড়যন্ত্র ভেদ করার চেষ্টায় চলল নিষ্ঠুর প্রহার। আধমরা হরিপদ কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলল না। বালক বয়সে কিশোর কিন্তু মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার সাহস তার অসীম। অপরিসীম তার দেশভক্তি, মনের জোর পর্বতপ্রমাণ। পুলিশ বুঝল বিপ্লবী দলের এই নতুন সভ্যটির শিক্ষা সূর্য সেন এবং নির্মল সেনের কাছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা তখন চলছে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। শোনা গেল যে সংবাদটা শুনে চট্টগ্রাম জেলে, বিচারাধীন বন্দীরা আনন্দে আত্মহারা। যে বর্বর মানুষটা ছিল বিপ্লবী এবং সংশ্লিষ্টদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের মূলাধার তার অপমৃত্যুতে নাটকের আর এক অঙ্ক শেষ। আসানুল্লা তখন ছিলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন তদন্তে নিযুক্ত গোয়েন্দা বাহিনীর একজন অফিসার।

প্রকাশ্য প্রতিশোধ

বেসরকারি ইউরোপীয়দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পুলিশ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাতারাতি ঠিক করলেন আসানুল্লা হত্যার প্রকাশ্য প্রতিশোধ নেবেন — সুনিয়ন্ত্রিত অত্যাচারে, চট্টগ্রামবাসী হিন্দুদের ওপর। প্রথম পদক্ষেপে সন্দেহের অবকাশে গ্রেপ্তার করা হল শতাধিক যুবক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকদেরও এবং কোতওয়ালিতে আটক রেখে চলল তাদের ওপর অবিরাম অত্যাচার — যদি কোনভাবে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামীদের কিছু খোঁজ খবর তাদের কাছে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে শহরের অ-সামাজিক গুণ্ডাদের জড়ো করে তৈরি রাখা হল পরিকল্পিত পরবর্তী পাশবিক তাণ্ডব লীলার জন্য।

এই সব ষড়যন্ত্রের আরও একটা পূর্ব-পরিকল্পিত দিক ছিল। প্রেসের মুখ বন্ধ রাখার জন্য ঠিক আগের দিন, মাঝ রাত্রে, একদল বে-সরকারি ইংরেজ সদলে চড়াও হল বাংলা দৈনিক পত্র 'পাঞ্চজন্য'র সহ-সম্পাদক হরেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি এবং নির্দয় ভাবে মারধোর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার পর, হাতুড়ি মেরে প্রেসটা দিল চুরমার করে যাতে পত্রিকা প্রকাশ কোনমতেই সম্ভব না হয় আর স্থানীয় সংবাদ জানাজানি হওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এই সব ঘটনার দিন দুয়েক আগে কলকাতার এক ইঙ্গ-ভারতীয় দৈনিক পত্র 'বিপ্লবী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকরী ভাবে সাহায্য

এবং সমর্থনের' দোষারোপ করে এই স্থানীয় পত্রিকাটির বিরুদ্ধে এক সম্পাদকীয় লিখেছিল। এটা ছিল ঐ কাগজে প্রকাশিত নিয়মিত অভিযোগের একটি। বিপ্লবী ঘটনা তো বাংলাদেশের বহু জায়গায় ঘটেছে কিন্তু স্থানীয় সাহেবরা তক্কে তক্কে ছিলেন প্রতিশোধের একটা সুযোগের অপেক্ষায়। সময় এবার এল সেটা নেওয়ার। এই প্রেস ভেঙে কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচণ্ড অসুবিধা এবং বিপদের কারণ হল, সমগ্রভাবে পুরো সম্প্রদায়ের কোন সংবাদই কেউ পেলেন না।

যা দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম, আজ চার দশকের পরও সে কথা ভাবতেও আমি শিউরে উঠি। কি বীভৎস অত্যাচার হয়েছিল হরিপদ এবং তার মা বাবার ওপর। পুত্রের প্রস্রাব জোর করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল তার মা বাবার গলায় (হরিপদর বাবা নিজে আমায় এ কথা বলেছেন)।

শুধু তাই নয়, বসতবাড়ি আক্রমণ ছাড়াও, সামরিক গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন স্টিভেনসনের অধীনে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করেছিল এলাকার হাই স্কুলগুলি। বিশেষ ভাবে পাতিয়া হাই স্কুল এবং পি সি সেন হাই স্কুল — যেখানে সমগ্র ভাবে ছাত্রদের এবং বেশ কিছু শিক্ষকদের (যাঁরা ছাত্রদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন) অমানুষিক ভাবে মারধোর করা হয়েছিল কোন রকম বাছ-বিচার না করে।

এই হীন বর্বরতার কোন নজির কোথাও নেই। এ রকম অপ্রতিহত দৌরাত্ম্যে, অমানুষিক অত্যাচারে এবং ধ্বংসলীলায় একটা শহর এবং পুরো শহরতলি তছনছ করে দিয়ে তার প্রায় প্রতিটি নাগরিককে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে পদদলিত করা ঠিক যেন মধ্যযুগের নাদির শাহ আর চেঙ্গিস খাঁর ইতিবৃত্ত।

নিরপরাধ মানুষদের ওপর, সরকারি ব্যবস্থায়, সমগ্রভাবে বর্বরোচিত অত্যাচার — এই নির্মম অবস্থার প্রতিকারে কিছু ব্যবস্থা করার চেষ্টায় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক মিলিত হলেন একটা বৈঠকে এবং ঠিক করলেন, আর কিছু না হোক অন্ততঃ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং অন্যান্য নেতাদের সংবাদ দেওয়া হোক কলকাতায় — যে তাঁরা যেন অবিলম্বে এসে এই বর্বর অত্যাচারের আগুন থেকে নিরপরাধ মানুষগুলোকে যেমন করে পারেন রক্ষা করেন। তাঁরা আরও জানালেন যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামীদের 'সাহায্য' করার সর্বৈব মিথ্যা অজুহাতে প্রত্যেক হিন্দু নাগরিকের প্রাণ এবং সম্পত্তি বিপন্ন।

এই মর্মে জরুরী তারবার্তা গেল যতীন্দ্রমোহনের কাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল যে তিনি আসছেন। সংবাদটা শুনেই জেলা কলেক্টর কেম সাহেব প্রমাদ গুনলেন। ঐ পর্যায়ের নেতা যদি এসে অবস্থার হাল ধরেন তাহলে ফলাফল কি হবে সেটা সম্যক উপলব্ধি করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতা ত্রিপুরাচরণ চক্রবর্তীকে

জানিয়ে দিলেন যে চারিদিক থেকে সমস্ত সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কাজেই তাঁরা প্রস্তাব করছেন যে যতীন্দ্রমোহনের আসার কোনই প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। কিছু অনুগামী এবং সঙ্গী নিয়ে যতীন্দ্রমোহন ইতিমধ্যেই রওনা হয়েছেন।

কলকাতায় খবর

ইতিমধ্যে, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাস আর খ্যাতনামা কবিরাজ যতীন্দ্র রক্ষিত ঘটনার ইতিবৃত্ত নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায় খবরটা সকলকে সবিস্তারে জানাতে। কলকাতা পৌঁছেই মহিমবাবু গেলেন দেশপ্রিয়র বাড়ি এবং তাঁকে চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষয় ও ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ দিলেন। দেশপ্রিয় অবাক হলেন যে এত বড় দৌরাত্ম্যের অতি সামান্য সংবাদটুকু পর্যন্ত কলকাতার কোন কাগজে প্রকাশিত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের প্রেস দমননীতি যে এত প্রকট হতে পারে তা ওঁর ধারণাই ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে এলবার্ট হলে জনসভার আয়োজন হল এবং মহিমবাবু তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় বিশদ বিবরণ দিলেন চট্টগ্রামবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ব্রিটিশের বর্বরোচিত তাণ্ডব নৃত্য এবং হত্যাকাণ্ডের। জানালেন নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষগুলোর ওপর লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড এবং নির্মম অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী। সভাতেই গঠিত হল 'চট্টগ্রাম তদন্ত সমিতি'। সভাপতি হলেন যতীন্দ্রনাথ বসু আর সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ, বি এন শাসমল, ডঃ জে এম দাসগুপ্ত, টি সি গোস্বামী, সত্যানন্দ বসু, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক পেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাজি আবদুল রসিদ খাঁ। পরে হাজি সাহেবের পরিবর্তে এলেন আশ্রাফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সমিতির সম্পাদক হলেন নিশীথ সেন।

যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম পৌঁছানোর দিনদুয়েক আগে বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এবং সমাজসেবী সুশান্ত চৌধুরী আর কার্যরত সাংবাদিক হিসেবে আমি বেরিয়ে পড়লাম চট্টগ্রাম শহরতলিতে এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে ঐ পাশবিক দৌরাত্ম্যের সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে — কিছুটা প্রেসের জন্য, বাকি এবং বেশিটা যতীন্দ্রমোহনের তদন্ত সমিতির জন্য। সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত গ্রামের মধ্যে পাঁচটি বেছে নিয়ে আমরা দিনরাত ঘুরে ঘুরে চাক্ষুস দেখলাম। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী কি নৃশংস ভাবে প্রতিটি হিন্দু বাড়ি লুটপাট করে, ভেঙে, পুড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। সে যে কি আতঙ্কের দৃশ্য — তাদের অমানুষিক অত্যাচারে ছেলে, বুড়ো, নারী, শিশু কেউ বাদ যায়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হতবাক হয়ে শুনলাম রক্ত জল করা মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী। দেখলাম তখনও শয্যাশায়ী গুরুতর ভাবে আহত মানুষদের। পুলিশের লাঠি আর গুর্খা সৈন্যদের কুকরি নির্দয় ভাবে চিহ্ন রেখে গেছে প্রায় প্রতিটি মানুষের

দেহে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাদের দড়ি বেঁধে, গাছে ঝুলিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে। গাছে গাছে তখনও দড়ি ঝুলছে। পুলিশ সাহেবও ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিয়ে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে বুকে, পেটে, পিঠে বুটশুদ্ধ লাথি মেরেছেন, যখন ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে, কোন কারণের বালাই না রেখে। বহু জায়গায় রক্তের ধারা তখনও ভাল করে শুকোয়নি। যেদিকে তাকাই কেবল ধ্বংসস্তূপ। এমন একজোড়া চোখ দেখলাম না যাতে আতঙ্কের করাল ছায়া নেই, সব হারানোর নিঃশব্দ আর্তনাদ যেন।

সদলে দেশপ্রিয়র আগমন

তদন্ত সমিতির সভ্যদের নিয়ে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে এলেন 7 সেপ্টেম্বর এবং সূচনা হল বহু স্মরণীয় ঘটনার। যে মেল ট্রেনে ওঁরা সদলে আসছিলেন সেটা যখন চট্টগ্রামের ঠিক আগের স্টেশনে পাহাড়তলিতে পৌঁছাল, এস ডি ও সাহেব দেশপ্রিয়র সঙ্গে ট্রেনের কামরায় দেখা করে সবিনয়ে অনুরোধ করলেন ওখানে নেমে, স্টেশনের ধারেই প্রতীক্ষারত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আই সি এস কেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। দেশপ্রিয় বেদনাহত, তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নয় যাত্রাভঙ্গ করে কারো সঙ্গে দেখা করার। বেশ কড়া ভাবেই দেশপ্রিয় জবাব দিলেন, "ভাবলেন কি করে যে আমার নিজের লোকেদের সঙ্গে দেখা না করে, প্রস্তুত না হয়ে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করব? আপনি বরং তাঁকেই গিয়ে বলুন, তৈরি হয়ে এসে আমাদের তদন্ত সমিতির শুনানীতে তাঁর বক্তব্য যেন তিনি নিবেদন করেন!"

এস ডি ও সাহেব ফিরে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হয়তো নতুন করেই বুঝলেন যে যতীন্দ্রমোহন সামান্য নয়, শক্ত ঘাঁটি। অবশ্য নতুন করে বোঝার কোন কারণ ছিল না। শুধু ওঁরই নয় ও তল্লাটে সব সাহেবেরই জানা ছিল যে ঐ চট্টগ্রামেরই মাটিতে বি ও সি এবং এ বি রেলের স্ট্রাইকে নেতৃত্ব দিয়ে ইউরোপীয় সাহেবদের কিভাবে বিপর্যস্ত করে তাঁদের বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রথম দু'দিন, দেশপ্রিয় এবং তদন্তকারী সঙ্গীরা শহরের প্রায় প্রতিটি ব্যবসা কেন্দ্র পরিদর্শন এবং ব্যক্তিবিশেষদের সঙ্গে দেখা করে ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি নিলেন। তারপর নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিধ্বস্ত গ্রাম পরিদর্শনে। বর্ষাকাল, মেঠো পথঘাট কর্দমাক্ত, কোথাও কোথাও বা হাঁটুজল, সবকিছু তুচ্ছ করে জনসাধারণের প্রিয় 'যতীন ব্যারিস্টার' আর 'মাস্টারবাবু' গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ওঁদের জন্য প্রস্তুত ছিল পালকি কিন্তু ওঁরা কিছুতেই নিলেন না। পায়ে হেঁটে প্রত্যেক গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা বললেন, তাদের করুণ কাহিনী মন দিয়ে

শুনলেন। মানুষের প্রতি মানুষ যে এমন পাশবিক ভাবে দানবীয় দৌরাত্ম্য করতে পারে তার চাক্ষুস প্রমাণ দেখে চমকে উঠলেন, হতবাক হয়ে যেন সহানুভূতিরও ভাষা হারালেন।

গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন ওঁরা দুদিন। দেশপ্রিয় মর্মাহত, বেদনা যেন তাঁর অন্তরাত্মার মূলে মাথা খুঁড়ে মরছে। সঙ্গীদের বললেন এই দৌরাত্ম্যের পিছনে হয়তো আছে দেবতার হাত। স্পষ্টভাবেই সপ্রমাণিত হয়েছে যে কি নির্মমভাবে ঐ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিজেরাই সৃষ্টি করে আগুনের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর অতি-দানবীয় অত্যাচার করেছে। তাঁর মনে পড়ে গেল প্রয়াত লালা লাজপৎ রায়ের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক উক্তি "এই ধরনের দৌরাত্ম্যই হবে ব্রিটিশ রাজের কফিনের শেষ পেরেক।" এ কথা লালাজী বলেছিলেন লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরোধী শোভাযাত্রায় মাথায় পুলিশের লাঠি খেয়ে। তাঁর সেই উক্তি ছিল যেন ভবিষ্যৎ-বাণী।

তদন্ত পর্বে গ্রাম পরিদর্শন শেষ করে, বর্তমান লেখককে দেশপ্রিয় বললেন সব কিছু সবিস্তারে লিখে রাখতে। এই ঘটনাবলী যে চট্টগ্রাম গণ্ডগোল সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত বিবৃতিরই নিশ্চিত প্রমাণ। এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনই সন্দেহ নেই। সরকারি ভাবে এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে সব বাজে কথা। এগুলো কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নয়, পুলিশ এবং সৈন্যদের অপকীর্তি। সদর্পে বললেন, শেষ পর্যন্ত উনি লড়বেন, দোষীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেনই করাবেন। আর, ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন।

কলকাতা ফেরার আগে যতীন্দ্রমোহন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তদন্ত সমিতির অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অনুরোধ করলেন যে 'ন্যায়নিষ্ঠ' সাহেব হিসেবে, এই ঘোর অন্যায়ের প্রতিকার যেন তিনি করেন। পরের ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে কমিশনার সাহেবের 'ন্যায়নিষ্ঠ' মন দেশপ্রিয়র কথায় কান দিয়েছিল।

সদলে কলকাতা ফেরার পর টাউন হলে জনসভা হল 13 সেপ্টেম্বর। দেশপ্রিয় তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় চট্টগ্রামের নৃশংস কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বললেন যে তদন্ত সমিতির ঐকমত্যে, সরকারি এবং বে-সরকারি সাহেবদের শক্তি এবং সাহায্য নিয়ে এ সবই পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর দানবীয় দৌরাত্ম্য। মাঝে মাঝে, বিশেষ ভাবে যখন নিরীহ গ্রামবাসীদের নির্যাতনের কাহিনী বলছিলেন ওঁর কণ্ঠ ছিল ভাঙা, দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত। বজ্রমুষ্টি তুলে ব্রিটিশ সরকারকে সদম্ভ আহ্বান জানালেন, যদি পারেন তদন্ত সমিতির সিদ্ধান্ত যে ভুল সেটা প্রমাণ করুন।

"সরকারের সম্ভ্রম ছুরিকাহত" —রবীন্দ্রনাথ

চট্টগ্রাম (অগাস্ট 30-31 — সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) সামগ্রিক ভাবে মানুষের

ওপর বর্বরতার জন্য ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বিবৃতি দিয়ে বললেন ঃ

> চট্টগ্রামে এবং বাংলার বিভিন্ন গ্রামে নৃশংস অত্যাচারের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি শুধু বেদনারই নয় লজ্জারও কাহিনী। নিঃসন্দেহে এটা নিদারুণ দুঃখের কথা যে এতে ব্রিটিশ সরকারের ওপর আমাদের বিশ্বাস ক্রমেই নষ্ট হচ্ছে। এই নিষ্ঠুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁদের নৈতিক মান এবং সম্ভ্রমকে পিছন থেকে পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাহত করেছে। আমাদের জাতির কোন বিশেষ শ্রেণী যে এইভাবে জাতীয় ঐতিহ্যকে বিষাক্ত করে ইতিহাসকে অপবিত্র করতে পারে সে কথা ভাবতেও হৃতিমান হতে হয়।
>
> এটা প্রকৃতিগত নিয়ম নয় যে বহু দূরে অবস্থিত কোন দ্বীপবাসী ভারতের ওপর চিরকালীন দখলদারী বিস্তার করবে। আমরা, হিন্দু এবং মুসলমান একই মাটির কোলে দুই সন্তান, চিরকাল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ব, বিজয়ের গৌরব ভাগ করে নেব আর দোষ যারই হোক লজ্জায় একই সঙ্গে অধোবদন হব। এই হৃদয়-বিদারক সংকটময় অবস্থায়, পারস্পরিক দোষারোপের সময় নয়। তাঁদের মহৎ ধর্মের এবং সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সমস্ত ধর্মবাদী মুসলমানদের আবেদন জানাব যে রক্তাপ্লুত মানবতার কথা মনে করে, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসুন যাতে এই দুর্বৃত্তি স্থায়ী ব্যর্থতার মূল কারণ হয়ে, সমগ্র বিশ্বের কাছে এই দুর্ভাগা দেশকে হেয় এবং হীন প্রতিপন্ন না করে।

চট্টগ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারে ব্যথিত এবং বিব্রত হয়ে বাংলার লাট স্যার স্ট্যানলে জ্যাকসনকে জরুরী তার পাঠালেন হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক। জবাবে লাটসাহেবের সচিব জানালেন যে "খুনের পর লুটপাট এবং অন্যান্য অঘটন, সরকার বা তাঁদের কর্মচারীদের কারণে, ঔদাসীন্যে অথবা সাহায্যে বা সমর্থনে হয়নি। লাটবাহাদুরের কাছে যে তথ্য আছে, তাতে জানা যায় যে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার দূরদর্শিতা এবং কর্মতৎপরতার ফলেই দৌরাত্ম্য খুব সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছে।"

সরকারকে 'চ্যালেঞ্জ'

গভর্নরের এই মন্তব্যে আবার শুরু হল গভীর উত্তেজনা। বে-সরকারি তদন্ত সমিতির সভ্যরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে গভর্নরকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে, নানান কথার মধ্যে জানালেন যে "জনসাধারণের জোর তাগাদা এবং দাবি সত্ত্বেও আপনার সরকার তদন্তের কোন ব্যবস্থাই করেনি। ইতিমধ্যে আমাদের তদন্ত সমিতি, চট্টগ্রামে গিয়ে, গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে, নিপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলার পর বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি সংগ্রহ করেছেন... আপনার নির্দেশে সরকারি অনুসন্ধানের কোন সংবাদ জনসাধারণের আজও জানা নেই। অতএব, সমস্ত ঘটনাবলী পরিষ্কার ভাবে

* অমৃতবাজার পত্রিকা 6 সেপ্টেম্বর 1931

না জেনে আপনার এই স্থির সিদ্ধান্তে আসার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার মন্তব্য 'স্থানীয় শাসনব্যবস্থার দূরদর্শিতা এবং সাহায্য ও সক্ষমতা প্রয়োগের ফলেই দৌরাত্ম্য সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছে' আমরা মনে করি আপত্তিজনক। এটা শুধু বাস্তব ঘটনার অপলাপই নয়, জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমরা দাবি করি যে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং জেরা করার সুযোগ ও সুবিধা জনসাধারণকে দেওয়া হোক, বিশেষভাবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাক্ষীদের।

"আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে চট্টগ্রাম দৌরাত্ম্যের সময় নিপীড়িত বহু মানুষের নালিশ রদ করে দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে সরকারের অনুমতি না নিয়েই নালিশ করা হয়েছে। আপনারা যদি সেই অনুমতি দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে যে সব সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ আছে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।"

গভর্নর এই চিঠির উত্তর দিলেন দেশপ্রিয়কে, তাঁর সচিবের মাধ্যমে। সেটা তাঁর পূর্বোক্ত বিবৃতিকে সমর্থনের এমনই ক্ষীণ এবং হাস্যকর প্রচেষ্টা যে উত্তেজিত জনসাধারণের ওপর তার কোন প্রভাবই পড়ল না।

সরকারকে দেশপ্রিয়র চ্যালেঞ্জ

সরকারের বিরুদ্ধে দেশপ্রিয়র নির্ভীক উক্তির উল্লেখ করে কলকাতার দেশীয় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা, তাদের 16 সেপ্টেম্বর 1931 সংখ্যায় লিখল (কিছু উদ্ধৃত অংশ) ঃ

> এখানেই তিনি থামেননি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কেমের বিরুদ্ধে বহু ঘোরতর অভিযোগ করে উনি বললেন, সাহস যদি থাকে কেম সাহেবের তো আনুন ওঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ...
>
> মিঃ কেমের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রমোহনের অভিযোগ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করার সাহস কোন মানুষের আগে কখনও হয়নি। যতীন্দ্রমোহন একজন সর্ব-ভারতীয় নেতা। আইনজীবী হিসেবেও উনি ভালই জানেন ওঁর কাজের এবং কথার ফলাফল কি হতে পারে। তা সত্ত্বেও উনি যখন ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর তাঁর অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রকারান্তরে সরকারকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন তখন সহজেই বোঝা যায় তাঁর অভিযোগের কারণ কি এবং তার ওজন কতখানি। দেখা যাক সরকার কিভাবে তাঁর আহ্বান গ্রহণ করে এবং সাধারণের দৃষ্টিতে কিভাবে তারা নিজেদের ব্যক্ত করে...।

কর্পোরেশনের নিন্দাবাদ

জাতীয় জীবনে জ্বলন্ত কলঙ্ক হিসেবে চট্টগ্রাম দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে পৌরসভার মিটিংয়ে আলোচনার জন্য ওঠে 28 সেপ্টেম্বর, মেয়র বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে। ঐ হীন

দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করে শরচ্চন্দ্র বসু প্রস্তাব করেন যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত অপরিহার্য। তখন কাউন্সিলর যতীন্দ্রমোহন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে, আরও বহু তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় প্রস্তাবটি সমর্থন করে অন্যান্য নানান কথার মধ্যে বলেন ঃ

> যে সমস্ত জায়গায় ব্যাপারটা ঘটেছে, ব্যক্তিগত ভাবে, আমি সে সব জায়গা পর্যটন করে এসেছি ... কাজেই আমি মনে করি না যে নতুন ভাবে আর কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে।
>
> আমি জানি যে প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে (সরকারি অনুসন্ধান কমিটিতে বে-সরকারি সভ্য নেওয়া) সরকার কোনই দৃষ্টি দেবে না। তাহলেও, আমাদের কর্তব্য আমরা অবশ্যই করব। বে-সরকারি তদন্ত কমিটির বিবরণ আজ প্রকাশিত হয়েছে। ... একজনও মুসলমান ... তাঁদের সমর্থনে আমি বলতে বাধ্য ... তাঁদের ডাকা সত্ত্বেও, তাদের (পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী) সঙ্গে যোগদান করেননি। যে সামান্য কয়েকটি ঘটনায় তাঁরা জড়িত ছিলেন সেগুলো হল সোমবার দুপুরে (31 আগস্ট) শহরের কয়েকটি দোকান লুটপাট। সেইখানেই শুধু আছে সাম্প্রদায়িকতার সামান্য স্পর্শ। তাও আবার ঠিক সাম্প্রদায়িকতা নয়, বাজারের কিছু সমাজবিরোধী গুণ্ডার অপকীর্তি। এইটাই বে-সরকারি কমিটির সিদ্ধান্ত। এবং বাংলার জনসাধারণ এইটাই মেনে নিয়েছেন।

বে-সরকারি তদন্ত কমিটির বিবরণ প্রকাশিত হয় 28 সেপ্টেম্বর। সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিক মহল ঐ ঘৃণিত ঘটনার তথ্য পড়ে হতবাক। যতীন্দ্রমোহনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সরকার মুখ বুঁজে রইল, রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না।

ইতিমধ্যে ডিভিশনাল কমিশনার এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ নিয়ে গঠিত একটি কমিটি তদন্ত করল চট্টগ্রামের দৌরাত্ম্যের। তারা বিবৃতি এবং সাক্ষ্য নিল সরকারি এবং বে-সরকারি লোকদের — যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিপীড়িত এবং যাঁরা আগে বে-সরকারি কমিটিতে সাক্ষ্য বা বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে পার্থক্য কিছুই ছিল না (আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত ছিলাম)।

যতীন্দ্রমোহনের উদ্ধত চ্যালেঞ্জ তখনকার মতন উপেক্ষা করলেও, সরকার তার প্রতিশোধ নিল পরে। সেটা যে হবে — তাতে কোন সন্দেহই ছিল না।

নিয়তি

জে বি স্যুটার যিনি দৌরাত্ম্যের সময় চট্টগ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন এবং পরে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন গোয়েন্দা বিভাগে। তাঁকে এক শনিবার সকালে (23 জানুয়ারি) মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের এক ঘরে যেখানে তিনি থাকতেন। মাথায় গুলির আঘাতের চিহ্ন। তাঁর মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল একটা রিভলবার এবং সাধারণের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেন (অমৃতবাজার পত্রিকা, 24 জানুয়ারি সংখ্যা)।

কিছুদিন পর দেখা গেল কেম সাহেব (চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) কলকাতা এড়িয়ে দেশে ফিরছেন আকিয়াব এবং রেঙ্গুনের পথে। জানা গেল যে তাঁকে নাকি চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

আরও দেখা গেল বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সরকারি কর্মচারীদের হয় সাসপেণ্ড করা হয়েছে আর না হয় চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পরে জানা গেল যে সরকারি এবং বে-সরকারি দুই তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাবলী বিচার করে দুর্বৃত্ত অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য কাউকে বদলি করা হয়েছে, কাউকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে, কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

হিজলি হত্যাকাণ্ড ও তার পরিণাম

1931 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ শাসনের আর এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হল হিজলি বন্দীশিবিরে দুই বাঙালি রাজবন্দীকে (সন্ত্রাসবাদী বলে পরিচিত) গুলি করে হত্যা করে। চট্টগ্রাম কমরেডদের রক্তের সঙ্গে এই দুই শহীদের রক্ত মিশে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বজ্রমুষ্টিকে ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে শিথিল করে দিল। ব্রিটিশের পর পর এই দুই দুষ্কৃতি, দেশভক্ত দেশপ্রিয়কে করে দিল আরও ক্ষিপ্ত — পরে যার প্রজ্জ্বলিত প্রমাণ পাওয়া গেল লণ্ডনের মাটিতে — যে দেশের মানুষ আইন এবং শৃঙ্খলার অজুহাতে নিরপরাধ ভারতীয়দের ওপর অনবরত নিষ্ঠুর অত্যাচারে যখন যেখানে ইচ্ছে গুলি চালিয়েছে।

চট্টগ্রাম তাণ্ডবের পক্ষকালের মধ্যেই হিজলি জেলে (মেদিনীপুর) গুলি বর্ষণ হল 16 সেপ্টেম্বর, বহুকালব্যাপী সান্ত্রীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লব এবং সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার এবং নানা রকম জ্বালা যন্ত্রণার অভিযোগ করার পর। কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই ছিলেন সান্ত্রীদের পক্ষে এবং রাজবন্দীদের নিয়মিত অভিযোগ পত্র তারা কখনও গ্রাহ্যই করেনি। একদিন এক সান্ত্রীর সঙ্গে লাগল এক বন্দীর ঝগড়া এবং ফলে হল সংঘর্ষ। বলা হল যে সান্ত্রীর রাইফেল থেকে ঐ রাজবন্দী নাকি সঙ্গিনটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উঠল চরমে। পুলিশ, সান্ত্রী এবং ওয়ার্ডারদের এক বড় ধরনের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজবন্দীদের ওপর লাঠি, বন্দুক ইত্যাদি নানান রকম হাতিয়ার নিয়ে, আর চলল বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি। যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান দুজন, — সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রমোহনের প্রিয় অনুগামী সন্তোষ মিত্র ছিলেন মধ্য কলকাতা কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপতি আর কলকাতা সিটি কংগ্রেস লীগের সম্পাদক। বরিশাল-বাসী তারকেশ্বরও ছিলেন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী। ঐ গুলি চালনায় আহত হয়েছিলেন 20 জন রাজবন্দী, 4 জন গুরুতর ভাবে। জেল তো নয় যেন জল্লাদখানা।

যতীন্দ্রমোহন সংবাদ পেলেন সন্ধ্যাবেলায়। অধীর উত্তেজনায় অস্থির। হিজলি যাওয়া সম্ভব একমাত্র পরদিন সকালে। গেলেন, কিন্তু আন্তরিক আবেদন সত্ত্বেও ভেতরে যাওয়ার অনুমতি কিছুতেই পেলেন না। বাধ্য হয়ে খড়্গপুরে এসে দেখা করলেন আহতদের সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানে এনে রাখা হয়েছিল তাঁদের চিকিৎসার জন্য। যে সব বন্দীরা আহতদের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই উনি পেলেন হিজলি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ।

পরে কর্তৃপক্ষকে বললেন সৎকারের জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মৃতদেহ দুটি ওঁকে খড়্গপুরে সমর্পণ করতে। এবার আর কর্তৃপক্ষ 'না' বলতে পারলেন না। নিজের উদ্যোগে এক বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে আর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মৃতদেহ দুটি নিয়ে যতীন্দ্রমোহন নামলেন হাওড়ায়। শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার অসীম আগ্রহে স্টেশন লোকে লোকারণ্য। মালায় মালায় মৃতদেহ দুটি হয়ে উঠল যেন ফুলের পাহাড়। শোভাযাত্রায় শহর প্রদক্ষিণ করে শবদেহ দুটি নিয়ে যাওয়া হল কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে।

দেশব্যাপী হল শোকসভা। যতীন্দ্রমোহনের আন্তরিক অনুরোধে মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করলেন 26 সেপ্টেম্বর, টাউন হলে এক বিরাট শোকসভায়। তিনি বললেনঃ

> পরম বেদনাদায়ক এবং নৃশংসতার কাপুরুষোচিত অপকীর্তি। হিজলির এই হত্যাকাণ্ড আমাদের দৃষ্টি নিয়ে যায় নির্যাতিত মানবজাতির দিকে। বিরাট জনসভায় আসা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং মনকে বিব্রত করে। তা সত্ত্বেও যে দুটি প্রাণের কণ্ঠস্বর তাদেরই রক্ষীদের নরঘাতি নির্মমতায় চিরকালের মতন নীরব হয়ে গেছে, তাদের ডাক উপেক্ষা করতে আমি পারিনি।
>
> আজ আমি এখানে এসেছি আমার স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকারকে সতর্ক করে দিতে যে স্বাধীনতা দমনের নানান রকম মারাত্মক অস্ত্রের গর্বে গর্বিত হলেও, কোন প্ররোচনাতেই তাঁদের মান, ন্যায়ের মান, সততার মান, নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়। অন্যায় প্রতিবিধানের জন্য যান্ত্রিক ক্ষমতা আমার দেশবাসীর না থাক তাঁদের নৈতিক বিচারের অধিকার — যার ওপর নির্ভর করে বিদেশী শাসনের অস্তিত্ব — তাকে প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই।
>
> বীভৎস ভাষায় আমার অনুভূতি ব্যক্ত করার কোন বাসনা আমার নেই এবং পরবর্তী বক্তাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন একথা ভুলে না যান যে নিন্দাবাদের কোন ভাষাই, এই নিন্দনীয় অপরাধের যে বোঝা আমাদের অন্তর জুড়ে আছে, তা প্রকাশের পক্ষে কোনভাবেই যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই নিন্দাসূচক ভাষণের পর সরকার বাধ্য হল বিচারপতি এস সি মল্লিক আই সি এস এবং জে জি ড্রামণ্ডকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে গুলিচালনার ঘটনা ও তার যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখার ভার দিতে। অনুসন্ধানের পর তাঁরা যে রিপোর্ট দিলেন তার একাংশে বলা হল ঃ

> কিন্তু আমাদের মতে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে গুলি চালানোর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণই ছিল না

(আন্দাজ 29 রাউণ্ড গুলি চলে) ... যার ফলে দুজন বন্দী মারা যান। বন্দীদের প্রহার করার অথবা বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ করে তাদের আহত করারও কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল বলে আমরা মনে করি না ...।

কর্পোরেশনের নিন্দা প্রস্তাব

কর্পোরেশনে হিজলি হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হল 28 সেপ্টেম্বর। মিটিংয়ে তিনটি মূলতুবী প্রস্তাবের একটি ছিল যতীন্দ্রমোহনের সংশোধনে শরৎচন্দ্র বসুর। সেটি গৃহীত হল 42 ভোটের বিরুদ্ধে 5 ভোটে। বিপক্ষদলের নেতা ছিলেন ইউরোপীয় কাউন্সিলর মিঃ রস। অসুস্থ অবস্থাতেও যতীন্দ্রমোহন দৃঢ় কণ্ঠে বিপক্ষ দলের বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন ঃ

আমি ইচ্ছে করেই প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশ, যাতে বলা হয়েছে, "সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও কর্পোরেশনের মতে হিজলির ঐ আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে অন্যায়" সে বিষয় কোনই মন্তব্য করিনি। শরীর আমার ভাল নয় এবং উত্তর দেওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু রস সাহেব আমায় শক্তি জুগিয়ে দিয়েছেন চট্টগ্রাম এবং হিজলির দুষ্কৃতি প্রসঙ্গে সরকারি ইউরোপীয়ান এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বে-সরকারি ইউরোপীয়ানদের কিছু কঠিন আঘাত হানবার। আজ পর্যন্ত সেটা খুব জুৎ করে কখনই হয়নি।

আমি খুবই আশা করেছিলাম যে মিঃ রস আমার চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু কয়েকটা কথাই তিনি শুধু বলেছেন। আমি আবার তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি — যা ইতিমধ্যে করেছি — তিনি অথবা বাংলা সরকারের যে কোন কর্মচারি যদি মনে করেন যে আমি ভুল বলছি বা প্রত্যেক বাঙালী যা উচ্চ কণ্ঠে বলছে — যে হিজলিতে বন্দীদের ওপর আক্রমণ সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রই শুধু নয় ওটা দণ্ডনীয় ভাবে নরঘাতি — তা ভুল বলছে — তাহলে সাহস থাকে তো তাঁদের দাঁড় করান আমাদের কাঠগড়ায়। এ কথা আমি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যেমন বলেছিলাম তেমনি ওঁকেও গলা তুলে আরও দৃঢ় ভাবে বলছি — আর বলছি কলকাতার পাবলিক প্রসিক্যুটরকে — থাকে যদি সাহস তাহলে আমাকেই শুধু নয় এই সভার সমর্থনকারী প্রত্যেক সভ্যের প্রতি যেন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয় — যখন আমরা বলব এবং বলছি যে হিজলির হত্যাকাণ্ড গর্হিত, সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র, ইচ্ছাকৃত নরহত্যা।

এ কথা কেন বলছি? বলছি কারণ ঐ দুজন বন্দী যে ছিল ঠিক যুদ্ধের বন্দীর মতন সে কথা মুখে বলে প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন নেই যে তারা ছিল নিরস্ত্র। এ কথাও মুখে বলা বা সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে তারা জেল থেকে পালাবার প্রচেষ্টা কখনও কোন ভাবেই করেনি। এ কথাও প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না যে তারা বন্দুকের গুলিতেই নিহত হয়েছিল। আর কোনই প্রয়োজন নেই সাক্ষীসাবুদ দিয়ে প্রমাণ করার যে রাত নটার সময় — যখন তারা শুতে যাচ্ছিল তখন তাদের আক্রমণ করা হয়।

বলা হয়েছে যে কিছু রাজবন্দী সান্ত্রীদের আক্রমণ করে এবং একজনের সঙ্গিন ছিনিয়ে নেওয়ার ফলেই গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়। এটা কি মিঃ রসকে অথবা আমার বন্ধুদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে সরকারের ঐ একই কৈফিয়ৎ পত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে সঙ্গিন ছিনতাই করার পর সান্ত্রী যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং সময় পেয়েছিল তার বন্দুকে গুলি ভরার।

তাতে কি প্রমাণিত হয়? এধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মিথ্যার কোন সুযোগ নেই। একটি সান্ত্রীকে যদি শারীরিক ভাবে কাবু করেই থাকে, তাহলে কি মনে করেন বন্দীরা তাকে সুযোগ বা সময় বা সুবিধা দিত বন্দুকে গুলি ভরার?

যতীন্দ্রমোহনের লণ্ডন পরিভ্রমণ

চট্টগ্রামের দৌরাত্ম্য, হিজলির হত্যাকাণ্ড আর বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী থাকা থেকে তাদের মুক্তির সমস্যা ইত্যাদি নানান বিভ্রাটের ফলে দেশপ্রিয়র স্বাস্থ্য বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। এইসব মানসিক বোঝা আর আত্মার অবিরাম আর্তনাদ নিয়েই তিনি তৈরি হলেন বিলেত যাওয়ার জন্য। আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যোন্নতির একটা সুযোগ। রক্তের চাপ তাঁর ক্রমশই বেড়ে উঠেছিল এবং ডাক্তাররা পরামর্শ দিচ্ছিলেন বেশ কিছু দূরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে যাতে শরীর সেরে ওঠে। কিন্তু ওঁর মতন মানুষের পক্ষে বিশ্রাম কোথায়?

ঠিক সেই সময় ব্যাপকাকারে শুরু হল ধর-পাকড় অর্ডিন্যান্সের আওতায়। তাছাড়া সাতজন কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হলেন ক্রিমিন্যাল ল' অ্যামেণ্ডমেন্টঅ্যাক্ট অনুযায়ী। ময়মনসিং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এবং কলকাতার অন্য দুজনকে অযথা গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে, দেশপ্রিয় প্রায় তাঁর রোগশয্যা থেকেই এক বিবৃতিতে বললেন ঃ

> স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত শর্তাবলী উপেক্ষা করে সরকার এক গর্হিত নীতি অবলম্বন করছে। এই ভাবেই কি তাঁরা কংগ্রেস শুভেচ্ছার উত্তর দেবে? বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল' অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট আর কত দিন তার ঘৃণ্য মাশুল নেবে? বাংলা দেশে শান্তি যদি সুদূরপরাহত হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় এবং দায়িত্ব একমাত্র এবং কেবলমাত্র সরকারের। বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে তাঁরা যদি ধারা বদল না করে তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। এই অবস্থা বাংলাদেশ আর বেশি দিন সহ্য করবে না।

ইউরোপ যাওয়ার সব ব্যবস্থার পর দেখা গেল তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। চট্টগ্রাম আন্দোলনের সময় (1921-22) যে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তার জের তখনও টানছিলেন এবং রাজনীতিক কারণে মাঝে মাঝে ওকালতি বন্ধ করতে বাধ্য হওয়ায় ঋণমুক্ত হওয়ার উপায়ও খুব একটা ছিল না। বন্ধুদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে উনি রাজি নন। পরিশেষে টাকা নিলেন জীবন বীমা বন্ধক রেখে।

সস্ত্রীক বম্বে পৌঁছে প্রচুর অভ্যর্থনা পেলেন কে এম মুনসী, কে এফ নরিম্যান প্রমুখ নেতা এবং অন্যাদের কাছ থেকে আর দুদিন ধরে বাইরের বহু নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। 'স্বদেশী বাজার' (প্রদর্শনী) উদ্বোধন উপলক্ষে জনসাধারণকে অনুরোধ করলেন স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতে যা না করলে স্বাধীনতা কিছুতেই সম্ভব নয়। পরদিন সমুদ্রতীরের জনসভায় আন্তরিক আহ্বান জানালেন পূর্ণোদ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালু রাখতে। বম্বেতে ওঁরা ছিলেন কে এম মুনসীর অতিথি।

20 অক্টোবর তাঁরা লণ্ডন যাত্রা করলেন দু'মাসের জন্য। কে. এম. মুনসী, লীলাবতী মুনসী, নরিম্যান প্রমুখ বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং অন্য অনেকে জাহাজঘাটে এসে জানালেন বিদায় সম্ভাষণ।

লণ্ডন আগমন

দু'তিন সপ্তাহ সমুদ্রযাত্রার ফলে স্বাস্থ্যে যথেষ্ট উন্নতি বোধ করলেন। রক্তের চাপ কমল, শরীর ও মন অনেক চাঙ্গা হল। লণ্ডনে পৌঁছবার পর একটা বাসা ঠিক করে সস্ত্রীক গেলেন কন্যা এবং জামাতার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত নেলীর বৃদ্ধা মা মিসেস গ্রের সঙ্গে দেখা করতে। দুই দশকের পর দেশপ্রিয়র সঙ্গে এই ওঁর প্রথম দেখা। জামাই এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় নেতা — এ নিয়ে বৃদ্ধার গর্বের শেষ নেই। বড় সুখের মিলন। নেলী অবশ্য ওঁদের দুই পুত্র নিয়ে কয়েক বছর আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তাছাড়া, সব সংবাদ দিয়ে মাসে অন্ততঃ দুটো চিঠি লেখা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।

কিছুদিন বিশ্রাম এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার পর উনি গেলেন গান্ধীজী দর্শনে। তিনি তখন গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষে লণ্ডনে। সর্দার প্যাটেলের বার্তানুযায়ী গান্ধীজীকে দিলেন দেশের খবর, জানালেন বাংলাদেশের কথা আর চট্টগ্রাম এবং হিজলির হৃদয় বিদারক কাহিনী। ব্রিটেনবাসীদের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞায় এসব কোন খবরই লণ্ডনে কেউ পায়নি। ক্রমে ক্রমে উনি সুযোগ এবং সুবিধা পেলেন কিছু লোকের সঙ্গে ভারত প্রসঙ্গে আলোচনার।

লণ্ডনে মিটিং

কমনওয়েল্থ অফ ইণ্ডিয়া লীগের পার্লিয়ামেন্ট কমিটির নিমন্ত্রণে যতীন্দ্রমোহন বক্তৃতা দিলেন এক বৈঠকে যেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পার্লিয়ামেন্টের জনা কুড়ি টোরি সভ্য। গ্রিনফুল যতীন্দ্রমোহনকে তাঁরা সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য, বাংলার স্বনামধন্য নেতা এবং ব্যারিস্টার।

চট্টগ্রাম দৌরাত্ম্য এবং হিজলি হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ দিলেন যতীন্দ্রমোহন, শুনিয়ে দিলেন কিছু গূঢ় তথ্য আর দেখিয়ে দিলেন বেশ কিছু পুলিশের তাণ্ডব নৃত্যের ছবি যা বে-সরকারি তদন্তের সময় চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ওঁর সঙ্গেই ছিল।

হিজলির উল্লেখ করে তিনি পড়ে শোনালেন সরকারি তদন্তের রিপোর্ট, যাতে বলা আছে যে 'আক্রমণ ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক এবং পূর্ব-পরিকল্পিত।' আর

ব্যথিত কণ্ঠে বললেন সেই সব রাজবন্দীদের কথা যাঁদের তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানেন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে আর সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যাঁদের কোন যোগ না থাকা সত্ত্বেও বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য — 'প্রতিরোধ ব্যবস্থার' অজুহাতে।

যতীন্দ্রমোহন বললেন "6000 মাইল দূরে বসে ভারতকে শাসন করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ এবং তাদের নির্দেশে ভারতীয় পুলিশ আর সরকারি কর্মচারিরা ভারতীয়দের মুক্তি হরণ করে, তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, সম্পত্তি লুঠপাট, এমন কি খুন করতেও কখনও দ্বিধা করে না।"

আধঘন্টা বক্তৃতার পর একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হল যতীন্দ্রমোহনকে। উত্তরে তিনি জোর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদিতার কোনই যোগ নেই এবং খুন-খারাপিকে কংগ্রেস কখনও ক্ষমা করে না। কংগ্রেস, ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। সেটা যদি ভারত সরকার স্বীকার করে নিতেন, উনি জোর গলায় জানালেন, তাহলে বাংলায় বিপ্লবীদের ওপর তার সুপ্রভাব অতি অবশ্য দেখা যেত। ক্যাপটেন কার্টিস এবং তাঁর পরিবারবর্গকে খুন করায় কংগ্রেসের কোন দায় ছিল না, সমর্থনও কংগ্রেস করেনি। পরোক্ষভাবে পুলিশ এবং সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বে-সরকারি সাহেবরাই চট্টগ্রামে পাশবিক অত্যাচার করেছে। বিদেশী শাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় বা ভারতে শান্তি কখনও সম্ভব নয়। কড়া শাসন ভাল তো করবেই না, ফল হবে বিপরীত। বিপ্লবী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়া অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতাই তার একমাত্র উপায়।

চট্টগ্রাম তাণ্ডবের নিন্দায় গান্ধীজী

লণ্ডনে, 24 নভেম্বর, ফেডারেল স্ট্রাকচার সাব-কমিটি অনুষ্ঠিত এক সভায় গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতায়, ভারতের ভীতিজনক অবস্থার উল্লেখ করে বলেন, সম্প্রতি যতীন্দ্রমোহন এসেছেন চট্টগ্রাম এবং হিজলির কিছু ভয়াবহ বিবরণ নিয়ে। তাঁর মতে, দিল্লী চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, বাংলাকে তার আওতার বাইরে রেখে, সরকার, অহিংস কংগ্রেস কর্মীদের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করছেন, সন্ত্রাস দমনের মিথ্যা অজুহাতে। বাংলার সব রাজনীতিক দলের ঐকমত্যে স্বাক্ষরিত চট্টগ্রাম তদন্ত রিপোর্টের সারমর্ম হল চট্টগ্রামে 'ভাগ করে ভোগ কর' নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই ভাবে, গান্ধীজী বলেন, সরকার কখনই পারবে না সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে। কলকাতার রাজপথে সৈন্য সমাবেশ করলেও, সন্ত্রাসবাদীরা ভয় পাবে না আর কংগ্রেস কর্মীরাও তাদের আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করবে না।

গান্ধীজী বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বললেন কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের কোন সংশ্রব নেই।

দেশপ্রিয়র দ্বিতীয় সভা

ভারতীয়দের আর একটি সভা হয় ভিকটোরিয়া হলে। দীর্ঘ বক্তৃতায় যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম এবং হিজলি প্রাসঙ্গিক কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করার পর যাঁরা কংগ্রেস নেতাদের নিন্দা করে, পরোক্ষ ভাবে সনাতনপন্থীদের সাহায্য করছেন তাঁদের চ্যালেঞ্জ করেন সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে। ওঁর মতে, কেউ যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে অহিংস আইন অমান্য নীতি ভারতে অসফল তাহলে উনি যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, যিনি তখন লণ্ডনে এবং সভায় উপস্থিত, সভাকে সবিনয়ে নিবেদন করেন যে ভারতীয়দের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা না করে, আপোষে আলোচনা করাই সভ্যতার সঙ্কেত। সভা শেষে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী নীরবে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রাম ও হিজলির শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পার্লিয়ামেন্ট সভ্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় যতীন্দ্রমোহন বলেন যে ওঁর পক্ষে 6000 মাইল দূরে এসে ভারতের কোন কোণে কি ঘটছে তার আলোচনা ঠিক ততটাই অর্থহীন যতটা ওঁদের পক্ষে ভারতে গিয়ে বিলেতের ঘটনাবলী আলোচনা করা। এর একমাত্র সমাধান হল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া। ইংল্যাণ্ডবাসীদের কোন ধারণাই নেই যে ভারতে কি ঘটছে। গান্ধীজীর সঙ্গে নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়।

এসেক্স হল, স্ট্র্যাণ্ড-এ যতীন্দ্রমোহন আরো একটি সভা করেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু।

লণ্ডনে সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

ব্রিটিশ, ভারতীয় এবং মার্কিনী সাংবাদিকরা ওঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন লণ্ডনে। 'ফ্রি প্রেসের' সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যতীন্দ্রমোহন বলেন, 'মহামান্য বড়লাট এবং ভারত সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মতো বড়লাটও তাঁর বিবৃতিতে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ করেছেন যে ইংল্যাণ্ড ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে ইতিমধ্যেই সম্মত হয়েছে অথচ তার পরেই জাতীয়তাবাদী ভারতকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন তাঁদের দাবী অযৌক্তিক বলে। বাস্তবে ইংল্যাণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এক নিঃশ্বাসে এ কথা বলা যায় যে ভারত অধিকার পাবে নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণে আনার ঠিক পরমুহূর্তেই বলা যে ব্রিটিশ জিনিস বর্জন করা চলবে না — বড়লাটের পক্ষে এটা নিতান্তই ছেলেমানুষী। একদিকে বড়লাট চাইছেন নিরাপত্তা আবার অন্যদিকে ইউরোপীয় ব্যবসাদার ভিলিয়ার্স বলছেন কেন্দ্রের দায়িত্ব ছাড়াই প্রাদেশিক ভাবে

স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হোক। অবশ্য ভারতের কোন প্রদেশ সে বিষয়ে উপযুক্ত সে বিচারের ভার ভিলিয়ার্স এবং ভারতে অবস্থিত তাঁর সাদা চামড়া সম্প্রদায়। এগুলোকে বাতুলতা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়?' (অমৃতবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী 3, 1931)

লণ্ডন পরিত্যাগ — অবধারিত

ইতিমধ্যে স্পষ্টই বোঝা গেল যে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনন্য প্রতিনিধি গান্ধীজী শূন্য হাতেই দেশে ফিরছেন।

ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে জটিলতার সংবাদ পেয়ে, শরীর সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন তাঁর বিদেশবাস কমিয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা ঠিক করলেন। সমগ্র দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তার আর তার অবধারিত প্রতিক্রিয়া। সস্ত্রীক তিনি লণ্ডন ছাড়লেন 3 জানুয়ারী। ভারত পৌঁছবার দিন আন্দাজ 20 জানুয়ারী।

ফেরার পথে এলেন প্যারিস। ভারতীয় ছাত্রবা জানান হার্দিক অভিনন্দন। বহু ছাত্র, স্থানীয় ভারতীয় এবং ফরাসীদের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে যতীন্দ্রমোহন বললেন, ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ায় অবসর যাপনের পালা আচমকা শেষ করে উনি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

দু'দিন পর জেনোয়া থেকে উঠলেন এক ইতালীয় জাহাজে।

লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার

ভারতভূমিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্ত অযৌক্তিক এবং অন্যায় ভাবে ওঁকে গ্রেপ্তার করা হল বম্বেতে 20 জানুয়ারী এবং এই কাপুরুষোচিত কাজই ওঁর জীবনের মেয়াদ কমিয়ে দিল অনেকখানি। বয়স তখন ওঁর আটচল্লিশও পূর্ণ হয়নি।

ইতালীয় জাহাজ 'গঙ্গে' জাহাজ জেটিতে ভেড়ার আগেই ওঁকে গ্রেপ্তার করলেন সি আই ডি প্রধান পেটিগরা।

নেলী সেনগুপ্তার ভাষায়, "ভোর চারটের সময় 'গঙ্গে' জাহাজ জেটিতে ভেড়ার আগেই একদল পুলিশ উঠে এল জাহাজে যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করার জন্য। জাহাজের ক্যাপটেন তীব্র প্রতিবাদ জানালেন পুলিশের এই অনধিকার চর্চায় কারণ আমরা তখনও ইতালীয় পতাকার নিরাপত্তায় এবং সেই অবস্থায় পুলিশের কোনই অধিকার নেই কারো ওপর হস্তক্ষেপ করার। বাধ্য হয়ে তখন তাঁরা গেলেন ইতালীয় রাজদূতের অনুমতি আনতে আর সাড়ে সাতটায় ফিরে এসে গ্রেপ্তার করলেন যতীন্দ্রমোহনকে।

"জানা গেল যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাংলা সরকারের নির্দেশে আর, তাঁদের পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় যতীন্দ্রমোহনকে আটকে রাখা হল যারবেদা জেলে।

"গ্রেপ্তারের পরই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে। সেখানে দেখা করতে দেওয়া হল তাঁর ছেলে আর দুই সচিবের সঙ্গে যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন বম্বে থেকে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলে। একজন সচিব ওঁর সঙ্গে গেলেন পুণায় আর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, নেলী সেনগুপ্তা এবং দ্বিতীয় সচিব রওনা হয়ে গেলেন কলকাতা।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, 20 জানুয়ারী, 1932)।

ওঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তুমুল প্রতিবাদে বম্বের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে।

পুণা থেকে দেশপ্রিয়কে গোপনে কোথায় যে সরিয়ে ফেলা হল কেউ জানতেও পারল না। বোঝা গেল ওঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কাগজের (অমৃতবাজার পত্রিকা, 24 জানুয়ারি, 1932) একটা সংবাদ থেকে হঠাৎ জানা গেল যে ওঁকে নাকি পুলিশ পাহারায় দেখা গেছে রাণাঘাট স্টেশনে আর তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় সংবাদদাতা জেনেছেন যে ওঁরা নাকি দার্জিলিংয়ের পথে। পরে অবশ্য জানা গেল উনি দার্জিলিং জেলে বন্দী।

সরকারের পক্ষে (পুলিশ এবং কারাগার দপ্তর) এটা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার নিদর্শন যে ওঁর মতন ভগ্ন স্বাস্থ্য মানুষকে, জানুয়ারির প্রচণ্ড শীত আর বরফের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল দার্জিলিং। সঙ্গে ওঁর উপযুক্ত গরম কাপড় ছিল না বললেই চলে। সংবাদ পেয়েই যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত সচিবকে সঙ্গে নিয়ে নেলী সেনগুপ্তা দৌড়ে গেলেন দার্জিলিং — কিছু গরম কাপড় পৌঁছে দিতে।

নেলী সেনগুপ্তা জেল সুপারকে অনুরোধ করলেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এবং পাহাড়ের উচ্চতায় ওঁর স্বামীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে বলে ওঁকে অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হোক। তিন দিন পরই ওঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল জলপাইগুড়ি জেলে এবং সেখান থেকে আর কিছুদিন পরই কলকাতার আলিপুর জেলে।

আলিপুর জেলে দেশপ্রিয়

"আলিপুর জেলে থাকাকালীন (রাজদ্রোহিতার অপরাধে) আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম যখন জানা গেল যে দেশপ্রিয়কে জলপাইগুড়ি থেকে আনা হয়েছে আলিপুর জেলে আমাদের সঙ্গে রাখার জন্য।" (স্মৃতিকথায় লিখেছেন চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী)। (আনন্দবাজার, 25 জুলাই 1933)।

"আমরা আমাদের ঘর খালি করে দিলাম ওঁর থাকার জন্য। উনিও খুশি। ওঁকে আনা হয়েছিল চেয়ারে বসিয়ে। আমরা সমবেত হয়ে ওঁকে ঘিরে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। বন্দী অবস্থায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উনিও খুব খুশি হলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অনেক কথা বললেন, সবই প্রায় রাজনীতির বাইরে। এ

দেশে কারাগার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে বললেন, আর যাই হোক এখানে সংশোধনী কোন ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয় না। যেমন, উপযুক্ত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বলে ছিঁচকে চোর এখানে এসে হয়ে ওঠে ঘুঘু অপরাধী। আধুনিক যুগে জেলে সংশোধন ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন।

"কিছুদিন পর ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল দোতলার একটা ঘরে। উনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে থাকতে রাজি নন। রোজ দুপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে তাস খেলতেন। সাধারণতঃ আমি হতাম ওঁর পার্টনার আর অপর পক্ষে থাকত জহর বকসী এবং বসন্ত ভট্টাচার্য। বয়সে আমরা অনেক ছোট। ঠিক ছেলের মতন। 'চৌধুরী' বলে সম্বোধন করায় আমি আপত্তি করাতে হাসতে হাসতে বললেন, 'থাক, আর মাতব্বরি করতে হবে না!"

"অন্যান্য দিন কখনও কখনও বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। যেমন, একজনের আয়ে অনেকের নির্ভরশীলতা। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই স্বাবলম্বী নয় আর ভিখিরিও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সামাজিক কুপ্রথাও আমাদের কিছু কম নেই, যেমন বাড়িঘর বাঁধা দিয়েও পিতৃশ্রাদ্ধ অবশ্যই করণীয়। এসব ব্যবস্থা বদলানো বিশেষ দরকার। আমরা ছেলে আর মেয়েকে বাধ্য করি একে অন্যের পছন্দ অপছন্দ না জেনেই বিয়ে করতে। এটা ঠিক নয়, উনি বলেন, প্রত্যেকেরই পছন্দ অপছন্দ আছে। কাজেই সামাজিক বিধি-নিষেধের নিগড়ে তাদের বেঁধে রাখা অন্যায়।

"রাজনীতিক প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন তাঁর যুবা বন্ধুদের বলেছিলেন, আমি বহুবার বাংলা সরকারকে বলেছি রাজবন্দীদের (বিপ্লবী) মুক্তি দিতে। তাঁদের সঙ্গে আপস নিষ্পত্তি বিশেষ প্রয়োজন।

"অল্পকাল পরে উনি আরও অসুস্থ হলেন। জেল সুপার অনুমতি দিলেন আমাকে এবং আমার এক বন্ধুকে সর্বক্ষণ ওঁর সঙ্গে থাকার। সমগ্র রাত আমরা থাকতাম, ওষুধ দিতাম, সেবা করতাম কিন্তু অস্বোয়াস্তি ওঁর কিছুতেই কমত না। মাঝে মাঝেই বলতেন, "আমি বোধহয় আর বাঁচব না। এই জেলেই আমার প্রাণ যাবে।" কিছুদিনের জন্য ভাল হয়ে উঠলেন। এক দুপুরে ওঁর ছেলে শিশিরের জন্য প্রতীক্ষার সময় বললেন, "শিশির আমায় বড্ড ভালোবাসে।" থেমে বললেন, "নেলী আমার জীবনে আশীর্বাদ।" পরিশেষে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে আমায় বললেন, "চৌধুরী, জীবনটা উপভোগ করে নাও। উপভোগ হল আনুগত্য।"

"কয়েকদিন পর ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। যাওয়ার আগের দিন আমায় বললেন, "জানাশোনা মানুষকেও লোকে ভুলে যায়। বিস্মৃতির অতলে তারা হারিয়ে যায়। যাওয়ার আগে তাই এমন কিছু করে যাওয়া উচিত যাতে পৃথিবী কখনও ভুলতে না পারে।"

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হল রাজনৈতিক রোগী-কারাবন্দী হয়ে থাকার। পুলিশের পাহারায় এলাকার মধ্যে অল্প হাঁটাচলার অনুমতি ছিল আর দুপুরে ছিল সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে নেলী সেনগুপ্তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসার। এই হাসপাতাল থেকেই উনি নেলী সেনগুপ্তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন সমগ্র শহরব্যাপী পুলিশী অত্যাচারের মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার (এপ্রিল, 1933)।

অন্যান্য যাঁরা বিশেষ অনুমতি নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নলিনী রঞ্জন সরকার (পরে মেয়র এবং বড় ব্যবসায়ী) আর কিরণশঙ্কর রায় — দুজনেই ওঁর প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে অবশ্য ওঁরা অতীতের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করেছিলেন যে যতীন্দ্রমোহন ওঁদের নেতা।

ওঁর হাসপাতালে থাকার সময়েই হল কর্পোরেশনের নির্বাচন। রাজনীতির সঙ্গে ওঁর প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ না থাকলেও, কলকাতায় ওঁর উপস্থিতিই ছিল নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ঠ। সাধারণের বিশ্বাস যে ওঁরই ইচ্ছায় সন্তোষ বসু মেয়র নির্বাচিত হন এবং নেলী সেনগুপ্তা আর জে সি গুপ্তা নির্বাচিত হন অলডারম্যান।

ওঁর রক্তের চাপে কোনই উন্নতি না হওয়ায়, সরকার ব্যবস্থা করলেন ওঁকে পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার। স্থির হল রাঁচি যাওয়া (4 জুন 1933)।

রাঁচিতে বন্দীজীবন

যে বাড়িতে ওঁকে অবরুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল তার নাম 'নগেন্দ্র লজ'। বিশেষ ব্যবস্থায় ওঁর স্ত্রী এবং ভাইঝি ইলিন অনুমতি পেয়েছিলেন ওঁর সঙ্গে থাকার। অনুমতি ছাড়া অন্য কারো অধিকার ছিল না ও বাড়িতে যাওয়ার।

অমানিশা

অসুস্থ নেতার পক্ষে রাঁচির জীবন ক্রমেই যেন এক অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠল। নেলী আর ইলিন ছাড়া কথা বলার অনুমতি ছিল না অন্য কারো সঙ্গে। নিয়ন্ত্রণের নিষ্ঠুরতা এমনই কঠিন ছিল যে চিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং ওঁর বাল্যবন্ধু ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কেও দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি কারণ কোন এক কালে তিনি নাকি নাম করা বিপ্লবী ছিলেন। নিয়তি-নির্দিষ্ট দিনে (22 জুলাই 1933), প্রাত্যহিক নিয়মমত পুলিশের পাহারায় নেলী এবং ইলিনার সঙ্গে দেশপ্রিয় মোটরে করে গেলেন বেড়াতে। গলফ্ কোর্সের কাছে গাড়ি থামিয়ে, চাইবাঁসা

রোডের ধারে এক মাঠে হকি খেলা হচ্ছিল, সেটা দেখতে গেলেন কয়েক পা হেঁটে কিন্তু দুর্বলতা এত' বেশি যে দাঁড়ালেন না। লজে ফিরে কিছু তাড়াতাড়িই খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। শোওয়ার পরই শুরু হল মাথা ব্যথা। বেশ অস্থির হয়ে উঠলেন। কথা বলারও শক্তি রইল না। রাত বাড়ল। হঠাৎ এক সময় জোর গলায় কিছু বললেন কিন্তু নেলী এবং ইলিনা আসার আগেই জ্ঞান হারালেন। সিভিল সার্জেন ওয়াইটকে সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এলেন, পরীক্ষা করে একটা শিরা কেটে দিলেন যাতে রক্তের চপ কিছু কমে। উনি নিথর শুয়ে, হাত নাড়ার ক্ষমতা নেই, কথা বলারও শক্তি নেই। পরে বোঝা গেল রক্তচাপের ফলে পক্ষাঘাত। অন্য ডাক্তার এল, নার্স এল', জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টাও অনেকই হল কিন্তু সবই হল ব্যর্থ।

জীবন শেষ হল 22-23 জুলাই (1933) রাত 1টা বেজে 45 মিনিটে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রীকে কিছু বলতে কিন্তু পারেননি। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল। তারপরই অমর আত্মা চলে গেল বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলের বাঁধন কেটে।

অমরের দলে দেশপ্রিয়

মৃত্যুর সময় ওঁর দুই ছেলে এবং ভাই রমেন্দ্রমোহন, কেউই কাছে ছিলেন না। রাত দুটোয় ওঁর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হল কলকাতায়। রমেন্দ্রমোহন সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দিলেন বিধানচন্দ্র রায়, জে সি গুপ্ত, নলিনীরঞ্জন সরকার ইত্যাদিদের যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থায় দেশপ্রিয়র মরদেহ কলকাতায় আনা হয়। সংবাদ গেল কাগজে। একটি পত্রিকা বড় বড় হরফে শিরোনাম দিল 'বাংলার সিংহ অনন্ত শয্যায়'। অন্য একটি পত্রিকাও পাতা জুড়ে লিখল 'শোকাহত সমগ্র দেশ'।

রাঁচিতে সমগ্র শহর ভেঙে পড়ল ওঁর অন্তিমযাত্রায়। শোকের স্রোতে শ্রদ্ধাঞ্জলির আবর্তে। স্থানীয় ইউরোপীয়ানরাও বাদ রইলেন না। পুলিশ সুপার বিওন সাহেব নেলী সেনগুপ্তার কাছে শোক প্রকাশ করে, ডি এস পি খান বাহাদুর আহসানের সহযোগিতায় ব্যবস্থা করে দিলেন রাঁচি এক্সপ্রেসে এক আলাদা কামরার।

23 জুলাই তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ যাত্রা করল কলকাতার পথে।

পাঁচ

বহুমুখী প্রতিভা

জয় পরাজয়ে অবিচলিত রাজনীতিজ্ঞ

ফৌজদারী উকিল হিসেবে যতীন্দ্রমোহনের পসার ছিল খুবই ভাল । শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। অসীম ছিল ওঁর দেশভক্তি। মানুষ হিসেবে অকৃত্রিম ভদ্রলোক এবং সারা জীবন একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়। রাজনীতিক ক্ষেত্রে বন্ধু এবং শত্রু সকলের কাছে সমান ভাবে আদরণীয় এবং ক্রীড়া প্রাঙ্গণে ওঁর উপস্থিতি ছিল অনুপ্রেরণার প্রতীক।*

বাল্যাবস্থার শুরু থেকেই খেলাধূলায় ছিল যতীন্দ্রমোহনের প্রবল আকর্ষণ। ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেট একাদশের উনি ছিলেন নিত্য এবং নিয়মিত খেলোয়াড়। টেনিসেও বিশেষ পারদর্শী। আসলে টেনিস এবং ক্রিকেট — এই দুই খেলার প্রতিই ছিল ওঁর যত আকর্ষণ তত ব্যুৎপত্তি। 1905 সালে, কলেজ ছাড়ার আগেই উনি খেলেছেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধি হয়ে আর কেমব্রিজেও খ্যাতি পেয়েছিলেন টেনিস এবং ক্রিকেটে। নৌকা চালনায় এমনই ছিল ওঁর নেশা যে 1930 সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে থাকার সময় অক্সফোর্ড বনাম কেমব্রিজ নৌকা প্রতিযোগিতার ফলাফল জানার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করার পর, স্বভাবতই হাইকোর্ট ক্লাব নিয়ে উনি মেতে ওঠেন এবং বিশেষ ভাবে টেনিস প্রতিযোগিতায় উনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনে ওঁর অন্যতম স্বপ্ন ছিল আন্তর্জাতিক টেনিস ক্লাব গঠন করার। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরও খেলাধূলায় ওঁর উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি। সারা জীবনের এই গভীর আসক্তির জন্যই ওঁকে বলা হত 'খেলোয়াড় মেয়র।'

---

* ক্যালকাটা মৃ্যনিসিপ্যাল গেজেট — যতীন্দ্রমোহন সংখ্যা।

উডবার্ন পার্কে সাউথ ক্লাবকে উচ্চতর মানে তোলার পিছনে ওঁর প্রচেষ্টা ছিল ঐকান্তিক, দান ছিল অনবদ্য। উনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং প্রধান একসিক্যুটিভ অফিসার জে সি মুখার্জীকে কার্যকরী ভাবে সাউথ ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন আর 20টি কোর্ট সমেত ক্লাবের পাকা বাড়ি বলা যায় ওঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। ওঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাউথ ক্লাব দেখতে দেখতে হয়ে উঠল এশিয়ার অনন্য আন্তর্জাতিক টেনিস ক্লাব। মেয়র থাকাকালীন উনি প্রথমে ফরাসী টেনিস টিমকে স্বাগত জানান। পরে অন্যান্য বহু দেশ থেকে আমন্ত্রিত হয় অন্যান্য টিম। যতীন্দ্রমোহন বহুকাল ঐ ক্লাবের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং ওঁর ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি আজও ঐ ক্লাবের সার্থক শোভা।

ওঁর খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তি যা সর্বদা ছিল জাতি, ধর্ম এবং বর্ণের ঊর্ধ্বে তারই অনবদ্য প্রভাবে সাউথ ক্লাব গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হয়ে।*

কলকাতার মেয়র এবং কংগ্রেসকর্মী হিসেবে অনন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও ক্রিকেট, ফুটবল বা হকির কোন ভাল খেলা উনি না দেখে থাকতে পারতেন না। ওঁর দীর্ঘ দেহ এবং ধবধবে সাদা খদ্দরের পোশাক ছিল চমকপ্রদ আকর্ষণ।

ওঁর প্রবল বাসনা ছিল ঢাকুরিয়া লেকে একটা বোট ক্লাব খোলার। এই প্রসঙ্গে ওঁর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হল স্যার বীরেন মুখার্জী, কে সি মহিন্দ্র ইত্যাদি ক্রীড়ামোদী মানুষদের সভ্য করে। ক্লাব যখন প্রতিষ্ঠিত হল, উনি তখন নেই। ঐ লেক ক্লাবের সঙ্গে এমনই ছিল ওঁর আন্তরিক যোগ যে ওঁকে যখন রাঁচি নিয়ে যাওয়া হয়, উনি তখন তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন লেকটা একবার ঘুরে যেতে যাতে লেক ক্লাবটা একটি বার উনি দেখে যেতে পারেন। ওঁর অনুরোধ পুলিশ অফিসার রেখেছিলেন। যার জন্য ওঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

কলকাতার মেয়র হিসেবে ওঁর যথেষ্ট মনোযোগ ছিল শহরের বিভিন্ন পার্কে শিশুদের জন্য খেলাধুলার আর বড়দের জন্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা — যেমন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ বিষ্ণু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারের উনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। ময়দানে স্থান পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ওঁর প্রবল বাসনা ছিল লেকের ধারে একটা স্টেডিয়াম করার।

পৃষ্ঠপোষকতার আবেদন নিয়ে অনেকেই আসতেন ওঁর কাছে আর উনিও তাঁদের উৎসাহ দিতে বা বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত করতে কখনও কার্পণ্য করতেন না। একবার চারজন যুবকের একটি দলের সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করার পূর্বে — তাদের বিদায় সংবর্ধনার জন্য ওঁকে সভাপতি করে এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভ্যদের অন্যতম ছিলেন প্রাক্তন ভাইস চ্যানসেলার ডাঃ সর্বাধিকারী এবং স্যার আর এন মুখার্জী। ভ্রমণকারী চারজন ছিলেন অশোক মুখার্জী (ক্যাপটেন), আনন্দ মুখার্জী, বিমল মুখার্জী এবং মহেন্দ্র বসু।**

---

* অমৃতবাজার পত্রিকা, 25 জুলাই 1933।

** 'অ্যান একজাইল ব্যাক হোম' — নির্মল চৌধুরী। হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, ডিসেম্বর 17, 1972।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জীবনের শেষ দিনেও ওঁর উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি এবং সেদিনও গাড়ি থামিয়ে, কয়েক পা হেঁটে গিয়েছিলেন হকি ম্যাচ দেখতে।

জাঁদরেল উকিল

ব্যারিস্টার হিসেবে যতীন্দ্রমোহনের সুনাম ছিল জাতীয় স্তরে। ফৌজদারি মামলায় পশার ছিল বিপুল। সমকালীন আইনজীবীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনকে গণ্য করা হত চিত্তরঞ্জন, জিন্না, জয়াকর, চিমনলাল প্রভৃতির সঙ্গে। রাজনৈতিক ব্যস্ততায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বার বার জেলে যাওয়ার ফলে ওঁর আইন ব্যবসায় যথেষ্ট বাধা পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা এবং বাইরে যে মামলাতেই উনি হাত দেন, তাতেই প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। জনপ্রিয়তায় এবং বিক্রমে চিত্তরঞ্জনের চেয়ে কোন অংশেই উনি কম ছিলেন না। খুন, ষড়যন্ত্র, বে-আইনী অস্ত্র রাখা, রাজদ্রোহ ইত্যাদি নানান জটিল অভিযোগের বহু রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের (বিপ্লবী) পক্ষ সমর্থনে ওঁর অনবদ্য কৌশল এবং পারদর্শিতার স্মৃতি আজও অনেকের মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

চট্টগ্রামে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে কুতুবদিন মামলায়, 17 জন বন্দীর পক্ষ সমর্থনে উনি চিত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন আর যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন মাঝে মাঝে ওঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জন্য। 1920 সালের পর বহু মামলায় উনি বিপ্লবী যুবকদের বেকসুর খালাস করিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল চট্টগ্রামের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ডাকাতি মামলায় (1923-24) সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী আর অনন্ত সিংহকে উদ্ধার করা আর, তারও পরে (1924) চট্টগ্রামে সি আই ডি সাব-ইন্সপেক্টরকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রেমানন্দ দত্তকে বেকসুর খালাস করিয়ে দেওয়া। এসবের আগে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সন্তোষ মিত্রের (অনন্ত সিংহের সঙ্গী) সাফল্যমণ্ডিত পক্ষ সমর্থন।

বাওলা হত্যার মামলা

দেশপ্রিয় ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ইন্দোরের এক অপূর্ব সুন্দরী নর্তকী মমতাজ বেগমকে রক্ষিতা করে রাখার ব্যাপারে বাওলা হত্যার মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করে। এই মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এক প্রভাবশালী নবাব আর অপরপক্ষে বম্বে পৌরসভার এক ধনী কাউন্সিলর। মমতাজ যখন ঐ নবাবের আওতা থেকে পালিয়ে আসেন, তখন বম্বের লক্ষপতি বাওলা তাঁকে নিজের রক্ষিতা করে রাখেন। ঈর্ষান্ধ নবাব তখন নানা রকম ষড়যন্ত্র করলেন মমতাজকে ছিনিয়ে আনার আর, তার সৌন্দর্য নষ্ট করার প্রচেষ্টায় ভাড়া করলেন একদল গুণ্ডা। বাওলা যখন মমতাজকে

নিয়ে মালাবার হিলে সুখ-বিহারে মত্ত তখন কিছু দুর্বৃত্ত তাঁকে গুলি করে হত্যা করে আর তাদের নেতা হাতেনাতে ধরা পড়ে এক ভ্রাম্যমান মার্কিনী দলের প্রচেষ্টায়। 25,000 টাকা আগাম আর এক লাখ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে যতীন্দ্রমোহনকে নিযুক্ত করা হয় প্রধান আততায়ী সফি আহমেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য। অন্যান্য আসামীদের পক্ষে ছিলেন জিন্না এবং ভেলনিকর — বম্বের দুই জাঁদরেল ব্যারিস্টার। যতীন্দ্রমোহন তাঁর অনন্য প্রতিভায় অন্য সকলকে ম্লান করে আদালতকে রীতিমত অবাক করে দিলেন। দিনের পর দিন বাদীপক্ষের বহু সাক্ষীকে জেরায় জেরায় এমন জর্জরিত করলেন যে স্তম্ভিত আদালত ওঁর সুনামে মুখরিত হয়ে উঠল। আসামীদের বাঁচানো অবশ্য সম্ভব হয়নি। তাই লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হয় ওঁকেই ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় এবং ওঁর পক্ষে বিলেত যাওয়া সম্ভব হয়নি।

গান্ধীজীর বিচার এবং যতীন্দ্রমোহন

3 মার্চ 1929 কলকাতার মির্জাপুর পার্কে (অধুনা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) বিদেশী বস্ত্র বর্জনের এক বহ্ন্যুৎসব হয়। তাতে গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, কিরণ শংকর রায়, জ্ঞানরঞ্জন নিয়োগী এবং আরও অনেকে। গান্ধীজীর আকর্ষণে বিরাট জনতা জড়ো হয় এবং ব্যাপারটা এক মহোৎসবে দাঁড়িয়ে যায়। সুযোগ নিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে যার ফলে কিছু লোকের মৃত্যু হয় এবং বহু লোক গুরুতর আহত হন। গান্ধীজী এবং অন্য বহু লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং কলকাতা পুলিশ অ্যাক্ট অনুযায়ী জনসাধারণের অসুবিধা ঘটিয়ে অযথা ভীড় করে শান্তিভঙ্গ করার অভিযোগে তাঁদের পেশ করা হয় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। গান্ধীজী এবং কিরণ শংকর রায়ের পক্ষ সমর্থন করেন অন্য বহু ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন। উনি বলেন যে ভীড় হয়েছিল পার্কের মাঝখানে অতএব বাইরে যারা ছিল তাদের শান্তি ভঙ্গ হয় কি ভাবে? অতএব মামলা কোনমতেই পুলিশ অ্যাক্টে পড়ে না।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গ গান্ধীজী এবং কিরণ শংকরকে জরিমানা করলেন এক টাকা, অনাদায়ে সাতদিন বিনাশ্রমে কারাবাস। যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শে 'বন্ধু' নামের আড়ালে জ্ঞানশংকর সেনগুপ্ত জরিমানা দিয়ে দিলেন।

রায় দেওয়ার সময় গান্ধীজী ছিলেন কলকাতার বাইরে। জরিমানা দেওয়া হয়েছে শুনে গান্ধীজী রেগে গেলেন। কলকাতার কিছু কাগজও ব্যাপারটার বেশ নিন্দা করল। সত্যাগ্রহী হিসেবে গান্ধীজীর মত ছিল কারাবরণ করা এবং এ বিষয় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি আলোচনাও করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন তখন গান্ধীজীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানালেন যে জরিমানা তাঁরই পরামর্শ মতন দেওয়া হয়েছে কারণ রক্সবার্গের রায় সম্বন্ধে হাইকোর্টের মতামত তিনি জানতে উৎসুক। ওঁর

উদ্দেশ্যের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গান্ধীজী ওঁর ওকালতির প্রশংসা করেন এবং নিন্দাবাদী পত্রিকাগুলোও কথাটা মেনে নেন তবে আপীলে গান্ধীজী আপত্তি জানান।

স্বল্পস্থায়ী ওকালতি জীবনে যতীন্দ্রমোহন অনেক খুনের মামলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে জেতেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় হল, ফরিদপুরে কাবুলী হত্যার মামলা যাতে জড়িত ছিলেন উত্তরপাড়া জমিদারের ছেলে। কলকাতার কোন ব্যারিস্টারই মামলাটা নিতে চাননি। কিন্তু উনি, ব্যাপারটা বুঝে, ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যে বিচারপতি সুর‍্যয়ার্দিকে বুঝিয়ে দিলেন যে আসামী নিরপরাধ। আসামী বে-কসুর খালাস পেয়ে গেলেন।

বহু মামলা উনি জিতেছিলেন চট্টগ্রামে। প্রখ্যাত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ওঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন পরম বুদ্ধিমান ব্যারিস্টার হিসেবে। বলেছিলেন, "আমার মনে আছে, আমার আদালতে উনি একবার এক খুনের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সমর্থনের দক্ষতা, যুক্তি এবং ব্যাখ্যায় ওঁর মেধা, সততা এবং আগ্রহের আতিশয্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওঁর বিশ্বাস উদ্রেকের ফলেই 9 জনের জুরী 5 ভোটের বিরুদ্ধে 4 ভোটে আসামীকে দোষী সবাস্ত করেন। বিচারক হিসেবে আমি জুরীকে বাতিল করে দিয়ে পুনর্বিচারের আদেশ দিই। পরবর্তী বিচার অন্য এক বিচারকের অধীনে হয় আসামী দোষী সব্যস্ত হয়। আমার কোর্টে যখন শুনানী হয়েছিল তখন ব্যক্তিগত ভাবে যতীন্দ্রমোহনের দক্ষতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের নিষ্ঠায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।"

খাঁটি মানুষ এবং দেশপ্রেমী-যোদ্ধা

"জাতিকে মহৎ করার ঐশ্বরিক পদ্ধতি হল মহৎ গুণে মানুষকে পরিপূর্ণ করা।" (লণ্ডনে চ্যাথামের স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ এডমণ্ড বার্কের উক্তি)।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে এমন মানুষ অল্পই ছিলেন যাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের মতন এত অল্পবয়সে এমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, যুক্তির বিচার, দৃষ্টি, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং নিজেকে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, মেধার ব্যাপ্তি, দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিকতার সমন্বয় ঘটেছিল যা দিয়ে বহু বৈপরীত্যের সঙ্গে একনাগাড়ে উনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন।

নিরলস সংগ্রামী

নেতৃত্বের প্রায় প্রথম মুহূর্ত থেকেই যতীন্দ্রমোহন ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। উনি দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনায় অবিরাম যুদ্ধ করেছেন পরম বিক্রমশালী ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে লড়েছিলেন সেই সব অনুগামী, বন্ধু এবং সঙ্গীদের সঙ্গে পরে যাঁরা ওঁর নিন্দাবাদী সমালোচক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন আর, ওঁর আদর্শ এবং নীতিবোধ নিয়ে লড়েছিলেন দলাদলি, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম

করেছিলেন ঠিকই কিন্তু নির্মুক্ত মনে, পরিষ্কার হাতে — বিশ্বাসের গভীর আবেগে, সততা এবং আন্তরিক অভিব্যক্তিতে। ধারাবাহিক ভাবে, যে সমস্ত ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কঠোর পরীক্ষা ওঁর সীমিত জীবনে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল — সেগুলো কখনও ওঁকে বিব্রত করেনি। ব্যাপক ভাবে ওঁর ব্যক্তিত্বকে বড় করায় সাহায্য করেছে, মানুষ হিসেবে মহত্বের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, কাজে, কথায়, ব্যবহারে এবং চারিত্রিক ভাবেও যতীন্দ্রমোহনের ছিল দৈত-ব্যক্তিত্ব। শক্তিমান বক্তার সত্তাও, স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপূর্ণ হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওঁর বৈশিষ্ট্য কিছু কম ছিল না।

সাদা ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবীর ওপর পরিষ্কার সাদা খাদির চাদরে মনে হত উনি যেন টোগা পরিহিত রোমের কোন মহাপুরুষ। লম্বা ছিলেন (ছ'ফুটের বেশি) কিন্তু কুঁজো কখনও হতেন না। বসায়, চলায় সর্বদা সোজা থাকতেন। চশমার নিচে তীক্ষ্ণধার চোখের ওপর চিন্তাশীল মানুষের প্রশস্ত ললাট, টিকোলো নাক — সব মিলিয়ে এমন এক রাজকীয় ব্যক্তিত্ব, যে মনে হত, উনি যেন নিজস্ব কোন পৃথিবীর নির্মুক্ত মানুষ। উনি যখন বিরাট জনতার মুখোমুখি হয়ে বক্তৃতা দিতেন, ওঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে এমন বজ্র-নিনাদে ফেটে পড়ত, মনে হত যেন পরম বিশ্বাসের অসীমতায় ওঁর অন্তরাত্মা মুক্তির পথ খুঁজছে।

থিও এইচ থর্প এস সি, ঠিকই বলেছিলেন ঃ

> প্রত্যেক মহৎ মানুষই ব্যক্তিত্বে দ্বৈত। একটা হল সর্বজনীন — প্রজ্জ্বলিত, অদম্য সমাচ্ছন্ন করার দুর্বার ক্ষমতা এবং অন্যটা একান্ত ব্যক্তিগত, নম্র, সরল স্নেহময়। যতীন্দ্রমোহনের এই দুই ব্যক্তিত্বই ছিল পূর্ণাঙ্গ। যাঁরা শুধুই ওঁর সর্বজনীন বক্তব্য শোনেন বা পড়েন, তাঁরা দেখেন উনি। আর, যাঁরা ওঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন, ওঁর মিষ্টি হাসি (হাসার পর প্রায় হামেশাই চশমা ঠিক করতেন) এবং কৌতুকরস বোধ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে ঐ দুই ব্যক্তিত্ব একই মানুষের।
>
> কিন্তু ভারসাম্য কখনও উনি হারাননি। যখন পরম বিশ্বাসে বক্তৃতা দিয়েছেন শ্রোতাদের উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তখনও আত্ম সংযম কখনও ওঁর শিথিল হয়নি। অসাধারণ বক্তা ছিলেন। নিজে সম্পূর্ণ ভাবে সংযত থেকে শ্রোতাদের মনে অগ্নি সংযোগ করতে পারতেন। কতবার এই নিয়ে কত ঠাট্টাই করেছি কিন্তু আমি জানি উনি আন্তরিক ভাবে উদ্বুদ্ধ হতেন এবং কেমব্রিজে শিক্ষিত আর হাইড পার্কের গণতান্ত্রিক বক্তৃতা পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে হয়তো স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারতেন না যে ওঁর বাংলা জাগরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদের ওপর কতখানি প্রভাব উনি বিস্তার করতেন। এর বিপদ নিয়ে বহুবার ওঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। তবে, উনি বলতেন, ওঁর দেশবাসীকে উনি আমার চেয়ে অনেক ভাল করে জানেন এবং বোঝেন।
>
> সন্দেহ অবশ্যই হয় কথাটা ঠিক কিনা। যাঁরা নিরপেক্ষ দর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এইসব রাজনীতিক খেলা দেখেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ খেলোয়াড়দের চাইতে অনেক বেশি দেখেন। আমি নিজে

যখন মাঝে মাঝে ছাত্রদের বক্তৃতা দিতাম তখন শ্রোতাদের প্রজ্বলিত চেহারা আর দৃষ্টি দেখে মনে হত, এদের অদম্য আগ্রহ তথ্যভিত্তিক বক্তৃতার জন্য নয়, রাজনীতিক পক্ষপাতিত্বের জন্যও নয় — অকৃত্রিম সত্যের জন্য।

সুদীর্ঘকাল ধরে (1925-31) কলকাতার মেয়র হিসেবে এবং বঙ্গীয় বিধানসভার অধিবেশনে উনি জনসাধারণের কল্যাণে সামাজিক এবং রাজনীতিক সব পরিকল্পনায় সর্বদাই হতেন অগ্রণী আর সব কিছুরই মূলে থাকত ওঁর ঐকান্তিক আদর্শ — বিদেশী শাসন থেকে দেশের মুক্তি। এই প্রসঙ্গে বহুবার বিভিন্ন ভাবে কড়া মন্তব্য করেছেন, সরকারি বক্তব্যের মনোনীত সভ্যদের, বিপক্ষীয় দলের বিরুদ্ধে কিন্তু সভার বাইরে, বিশেষ ভাবে টেনিস কোর্টে, খেলার মাঠে, ক্লাবের অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে উনি একেবারে আলাদা মানুষ — আন্তরিকতায় পূর্ণ বন্ধুত্বে অন্তরঙ্গ। প্রাক্তন বন্ধু এবং সঙ্গীরা রাজনৈতিক মতদ্বৈধতায় প্রায়ই ওঁকে আক্রমণ করলেও উনি প্রশান্ত মহিমায় হাসতেন। কখনও প্রকাশ্য ভাবে উত্তেজিত হতেন না বা এমন কোন কথা কখনও বলতেন না যা প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সমালোচকের অন্তরকে আঘাত করে। প্রায়ই দেখা যেত এই সব সময়ে হয় পাইপ টানছেন আর না হয় চশমা ঠিক করছেন।

সাধারণ মানুষের অনেক ওপরে উনি ছিলেন প্রকৃতিগত ভাবে প্রশান্ত। বাইরেটা ছিল ব্যাপ্ত ভাবে উন্মুক্ত এবং মানসিক ভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হলেও আচারে, ব্যবহারে, কথায় বা কাজে, উষ্ণতা, ভদ্রতা অথবা সহৃদয়তার কোন অভাব কখনই ঘটত না।

শিল্প এবং সংস্কৃতি প্রেমিক

যতীন্দ্রমোহন ছিলেন শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রেমিক আর এই দুইয়েরই সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষক। মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন নাটক এবং তখনকার দিনে খুব জনপ্রিয় না হলেও, বায়োস্কোপ বা সিনেমা। প্রথিতযশা নাট্যকারদের মধ্যে ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল বসুর। চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছানুসারে জাতীয় নাট্যশালা পরিকল্পনা নিয়েও এঁদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন ওঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সিনেমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, এই শিল্পের উন্নতির কথাও কম ভাবেননি।

চলচ্চিত্র জগতের প্রবীণ এবং প্রখ্যাত চিত্র-নির্মাতা, ডি জি নামে পরিচিত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মস্ লিমিটেডের স্টুডিও উদঘাটন কলকাতার মেয়র হিসেবে যতীন্দ্রমোহন করেন 1928 সালে।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাজে সাফল্য

যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অত্যন্ত উন্নত মানের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন।

এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক* কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক সভায় উপস্থিত ছিলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা আবৃত্তি করেন। এই সভার প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র যতীন্দ্রমোহন কিন্তু অন্য কোন একটা জরুরি কাজে আটকে পড়ায় সভায় পৌঁছাতে উনি কিছু দেরি করেন। উনি যখন এলেন তখন প্রায় মাধ্যমিক বিরতির সময় আর সভার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ সবে শেষ হয়েছে। যতীন্দ্রমোহনের মন ছিল কিছু উদ্‌ভ্রান্ত। তবুও, তিনি একটি ছোট চিরকুটে কবিকে অনুরোধ করলেন যদি দয়া করে আর একবার ওঁর কবিতা পাঠ করেন। সহাস্য স্বীকৃতিতে কবি আবার উঠে দাঁড়ালেন। সারা হল স্তব্ধ প্রতীক্ষায়। অনুপ্রাণিত আবেশে কবি আবার আবৃত্তি করলেন, '... যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে ...' কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় অপূর্ব সন্ধ্যা — যখন মেয়র যতীন্দ্রমোহন আর বিশ্বকবি মিলিত হয়েছিলেন মহিমান্বিত পরিবেশে।

বর্তমান লেখকের আর একটি ঘটনা আজও মনে আছে — যখন, আর একবার যতীন্দ্রমোহন তাঁর অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আমি তখন (1926-28) পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্র। কলেজ স্ট্রিট এবং হ্যারিসন রোডের মোড়ে ওয়াই এম সি এ-তে থাকি। 'আফটার ডিনার থার্টি ক্লাব' নামীয় এক প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে আমরা প্রায়ই নানা রকম অনুষ্ঠান করতাম।

একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে, কলকাতার বিশপ আর যতীন্দ্রমোহন ছিলেন আমাদের সম্মানিত অতিথি। অনুষ্ঠানের শেষে, তাঁর বক্তৃতায় যতীন্দ্রমোহন জোর দিলেন যে যুবকদের সৃষ্টিমূলক সাধনার উৎস হওয়া উচিত জাতীয়তা প্রধান এবং আদর্শ দেশমাতৃকার মুক্তি। কথাগুলো যতীন্দ্রমোহন বললেন চিন্তনীয় মনোভাবে। বিশপের উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বললেন দেশভক্তি, ভগবানের প্রতি ভালবাসা এবং মানবীয়তা সবই এক এবং অনন্য। আর, চেতনা হল বিচারের মান। মার্কিনী কবি এবং দার্শনিক এমারসনের উল্লেখ করে বললেন 'আধ্যাত্মিকতায় চেতনাই হল প্রধান বিচারক এবং সেই দেবোপম শক্তির একাগ্র সাধনই হল অনন্য পথ।' বিশপ তারই সুর টেনে সেই দেবোপম শক্তিরই আশীর্বাদ দিলেন সমবেত যুবকদের।

সমবেত যুবক সম্মিলিত অভিনন্দনে, কলকাতার দুই মনীষির উক্তির সর্বান্তকরণে সমর্থন জানালেন।

অক্লান্ত আর্ত সেবা

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পর্যুদস্ত মানবজাতির সাহায্য প্রচেষ্টা ওঁর কৃপালু মনকে এমন নিবিড় ভাবে নাড়া দিত যে যখনই কোন ডাক আসত উনি উঠে পড়ে লেগে যেতেন আর্তদের সেবা এবং সাহায্যের কাজে।

* লেখক এবং সমালোচক ভবানী মুখোপাধ্যায়

1923 সালে এক সামুদ্রিক ঝড়ে দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বিশেষ ভাবে কক্সবাজার বিশ্রীভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সময়টা ছিল ঠিক বর্ষার আগে এবং ঝড়ের পরই নামে প্রবল বর্ষা। সমুদ্রও অশান্ত। হাজারে হাজারে মানুষ গৃহহারা হয়ে যায়। বহু লোক আহত হয়। চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতা বরদা প্রসাদ নন্দী তার পাঠালেন যতীন্দ্রমোহনের কাছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে এসে সাহায্যের কাজ হাতে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা এলেন এবং সেবা আর সাহায্যের কাজও পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে গেল। ''যতীন্দ্রমোহন আর নৃপেনবাবুর নেতৃত্বে 30 জনের এক দল গঠন করে আমরা কক্সবাজার হয়ে চলে গেলাম তেকনাফে। তেকনাফ এবং রাসুর পথে কাতারে কাতারে লোক ওঁকে হার্দিক অভ্যর্থনা জানাল।

''অতি কষ্টে রাসু পৌঁছবার পর দেখা গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের জনসমুদ্র সমবেত হয়েছে দেশপ্রিয়কে অভ্যর্থনার জন্য। কেউ দল বেঁধে কীর্তন গাইছে, কোথাও মৃদঙ্গে আকাশ মুখরিত। তারা প্রায় সকলেই ঐ সামুদ্রিক ঝড়ে সর্বহারা কিন্তু সব দুঃখ যেন তারা ভুলে গেছে ওঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। কর্মীদের সঙ্গে দেশপ্রিয় প্রায় প্রত্যেকটি ভগ্নস্তূপ ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শনের পর নিজে হাতে সাহায্য দান করলেন সবাইকে।

''সহকর্মীদের সাহায্যে উনি পৌঁছে গেলেন নীলায়। ওটা একটা বাজার বিশেষ। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ওঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনার পর অকাতরে অর্থ সাহায্য করলেন। সেখান থেকে ওঁরা সদলে গেলেন রাসু। সেখানকার ব্যবসায়ী শিরোমণি খেজাফু চৌধুরী ওঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

''ঐ চট্টগ্রাম আরাকান সীমান্তে যতীন্দ্রমোহনের নাম শুনে আরাকান (বর্মা) থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক এলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। জানা গেল তিনি খুনের মামলায় জড়িত এবং আকুল প্রার্থনা যেন যতীন্দ্রমোহন আদালতে ওঁর পক্ষ সমর্থন করুন আট হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে। টাকার লোভে সাহায্যের কাজ ছেড়ে দেবেন? হেসেই উনি কথাটা দিলেন উড়িয়ে।''*

উত্তর বাংলা বন্যাত্রাণ

1931 সালের আগস্ট মাস। প্রচণ্ড প্লাবনে উত্তর বাংলার পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী আর জলপাইগুড়ি জেলা সম্পূর্ণ ভেসে গেছে। ক্ষতির কোন হিসেব নেই। মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। অবিলম্বে সাহায্যের জন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় গঠিত হল 'সংকট-তারণ সমিতি' যার সম্পাদক হলেন (গান্ধীবাদী) সমাজসেবী সতীশ দাশগুপ্ত। প্রাদেশিক কংগ্রেসও সাহায্য ভাণ্ডার শুরু করলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন চারিধারে খুললেন সাহায্য কেন্দ্র।

* লেখককে যে 'স্মৃতিকথা' বরদা প্রসাদ নন্দী (1977 সালে তাঁর মৃত্যুর আগে) দিয়েছিলেন তা থেকে উদ্ধৃত।

ওই সংকটময় মুহূর্তে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশপ্রিয় সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন। অনবরত ভাবছিলেন কি করে এবং কখন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করা যায়। এমন সময় পাবনা, বগুড়া আর রাজসাহী থেকে লোক এলেন ওঁর কাছে আর পাবনার নাম করা নাগরিক জ্ঞানরঞ্জন সরকার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিলেন যতীন্দ্রমোহনকে পাবনা জেলায় নিয়ে যাওয়ার। তারবার্তা পেয়ে প্রভাস লাহিড়ী ইশুরাদিতে এলেন যতীন্দ্রমোহনকে অভ্যর্থনা জানাতে। সেইখানেই বেশ বড় ধরণের এক দল গড়ে উঠল যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এবং তাঁরা হার্দিক অভ্যর্থনা পেলেন রেলপথে, স্টীমার পথে, প্লাবন বিধ্বস্ত প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে। আর্তরা পথের দু'ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সাহায্য পেল দু'হাতে।

ভাঙ্গুরা বেরা স্টীমার ব্যবস্থায় ওঁরা বন্যা বিধ্বস্ত বহু জায়গায় গেলেন যেমন গোপালনগর, ডেমরা, রাণতারা, ধূলিনে, পোর্জানা ইত্যাদি। দল যেখানেই থামল দুদণ্ড, সমবেত জনতা যতীন্দ্রমোহনকে সংবর্ধনা জানাল 'গান্ধী-লাট' (গান্ধী মহারাজের প্রতিনিধি) জয়ধ্বনি দিয়ে। এই নামকরণ হল ওঁর প্রতি স্থানীয় লোকেদের অসীম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার প্রতীক।

পথে যখনই সময় এবং সুবিধা পেয়েছেন তখনই আর্তদের উদ্দেশ্য করে উনি জনসভায় গভীর আবেগে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, "লাখে লাখে লোক মরছে জলে ডুবে, প্লাবনে ভেসে — তারা আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন। তারা মরছে রোগে, শোকে অথচ এদিকে সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত নাড়েনি। ব্রিটিশ শাসনের এটা একটা বেদনাদায়ক অপরাধের নিদর্শন এবং সারা ভারতের অপরিহার্য কর্তব্য একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের এই কুশাসন রাতারাতি শেষ করে দেওয়া।"

অন্যান্য ত্রাণ সমিতির কাজের প্রশংসা যতীন্দ্রমোহন সর্বদাই করতেন।

চট্টগ্রামে, আসানুল্লা খুনের পর হিন্দুদের ওপর লুটপাট, মারধোর, খুন, আগুন ইত্যাদি দৌরাত্ম্যের দুঃসংবাদ এবং অবিলম্বে সেখানে যাওয়ার ডাক উনি পান পাবনা জেলার পোর্জানায়। স্বভাবতই ঐ সংবাদে উনি অস্থির হয়ে বন্যাপীড়িত আর্তদের কাছ থেকে কোন রকমে বিদায় নিয়ে দু'দিনের মধ্যে ফিরে গেলেন কলকাতায়। চট্টগ্রাম রওনা হওয়ার অধীরতায়।

যতীন্দ্রমোহন এবং বাংলার বিপ্লবী

স্বাধীনতায় আসক্তি আর দেশমুক্তির সংগ্রাম — এই দুই বিষয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন — দুই প্রবীণ যোদ্ধা একই ধাতুতে গড়া। ভুলই হোক বা ঠিক, সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বিপ্লবী আন্দোলনে (সরকারের বিবৃতিতে 'সন্ত্রাসবাদী') ওঁরা দুজনেই প্রত্যক্ষ ভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ অধিবেশনের প্রস্তাব এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের দাবী যে রাজনৈতিক বন্দীদের (বিপ্লবী দলের) মুক্তি দেওয়া হোক — আজও সকলের কাছে অবিস্মরণীয়। এই দুই ব্যাপারেই বিপ্লবীদের বলা হয়েছিল যে তাঁরা হিংসানীতি পরিত্যাগ করুন যাতে শান্তিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং সরকারের পক্ষে রাজনীতিক নিষ্পত্তি সহজ হয়।

ঐ রাজনৈতিক বন্দীদের (বিপ্লবী) বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলে জ্যাকসন দেশপ্রিয়র সাহায্য চেয়েছিলেন (গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর) যাতে উত্তরোত্তর প্রাদেশিক প্রগতি এবং উন্নতির জন্য শান্তি কায়েম থাকে । দেশপ্রিয়কে এই প্রসঙ্গে অনুরোধ করা হয়েছিল যে বন্দীদের তিনি বুঝিয়ে দিন বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তির প্রয়োজন এবং প্রাধান্য। এই উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রমোহন গিয়েছিলেন হিজলি এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও প্রায় অনধিগম্য হিমালয়ের অভ্যন্তরে, ভুটান সীমানার কাছে বক্সা ক্যাম্পে আর হার্দিক আন্তরিকতায় আলাপ আলোচনা করেছিলেন রাজবন্দীদের সঙ্গে। তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত। নিরাপত্তা কর্মীরা এবং রাজবন্দীরা ওঁর সাদর অভ্যর্থনা করেন। বলা বাহুল্য, যে রাজবন্দীদের নিজের মতে আনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশপ্রিয় কিন্তু ওঁদের মতবাদকে উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

জানা যায় যে ওঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পূর্বাভাষে যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন যে বিদেশী শাসকেরা বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত বলেই তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক। ভূপেন দত্ত দেশপ্রিয়কে জানালেন যে সূর্য সেন (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দলপতি) যিনি বর্তমানে আত্মগোপন করে আছেন, বৈপ্লবিক কর্মসূচী রদ করার বিষয়ে তিনিই একমাত্র নেতা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। "কাজেই একান্ত প্রয়োজন তাঁকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেওয়া যাতে তিনি যুগান্তর পার্টির সভ্যদের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারেন।" আর "তাঁর আসা এবং নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সমস্ত সুবিধা দেওয়ার সুব্যবস্থা সরকারকে করে দিতে হবে।" যথাযথভাবে বক্তব্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করে (ভূপেনবাবুর মতে) প্রস্তাবটা যতীন্দ্রমোহন সরকারকে দিয়েছিলেন এবং এ কথাও জানিয়েছিলেন যে তাঁদের সম্মতি লিখিত ভাবে রাজবন্দীদের দিতে হবে। এই সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় এক ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা টিপ্পনি করল — "সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংযোগ কখনই নয়।" ইংরেজ সরকারও সেই মতবাদ সমর্থন করায়, আপস-নিষ্পত্তির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।*

কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত (6 মার্চ 1931) অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কনফারেন্সে দেশপ্রিয়র বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওঁর বিরুদ্ধে আর একটি পুলিশ রিপোর্টে (সন্দেহ করা হয় রিপোর্টটা পুলিশ কমিশনার কলিস তৈরি করেছিলেন লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসে কর্মরত স্যার চার্লস টেগার্টের সঙ্গে পরামর্শ করে) বলা হয় যে উনি

'ইতিহাসের উপাদান' — ভূপেন্দ্র দত্তর ধারাবাহিক রচনা। সাপ্তাহিক বসুমতী 1.6.1966 সংখ্যা।

নাকি বক্তৃতায় বলেছিলেন, ... "বন্ধুগণ, আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি বা ভারতীয়দের অনন্য অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিনিধি হয়ে আজ এখানে আসিনি। আজ আমি আপনাদেরই একজন হয়ে এখানে এসেছি। মহাত্মা গান্ধী হলেন আমার, আপনাদের, সারা ভারতের সমস্ত নরনারীর প্রতিনিধি। ..."

উনি যুবকবৃন্দকে আরও বলেছিলেন, "ভারত সরকার যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তার মর্মার্থ এবং সংশ্লেষ ভাল করে বোঝা একান্ত ভাবে দরকার। উনি যুবকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে গান্ধীজীর মতে ভারতে শান্তি কখনই সম্ভব নয় যদি না প্রত্যেক যুবাবন্দীকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া না হয়।" উনি আরও বলেছিলেন "হিংসানীতি অবলম্বী বন্দীদের মুক্তির দাবি আমি সর্বদাই করেছি এবং গান্ধীজীকেও বারবার বলেছিলাম যে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এই মুক্তির দাবি তিনি যেন অবশ্যই করেন। পরে অবশ্য দেখা গেল শান্তির শর্ত হিসেবে এটা সম্ভব নয়।

"বন্ধুগণ, আমি আপনাদের দোষ দিই না। আপনাদের মহিমান্বিত মনোভাব আমি ভাল ভাবেই জানি। আপনারা সকলেই চান যে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি অপরিহার্য। কিন্তু আপনারা জানেন না যে ঐ 500 যুবক যাঁরা বিনা বিচারে, বিনা কোন নির্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বন্দী হয়ে আছেন তাঁরা কংগ্রেসের কর্মী এবং প্রায় সকলেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ কথা আমি গান্ধীজীকে বলেছি, অন্যদের বলেছি, সবাইকে বলি তাঁরা নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী এবং অনেকেই বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সদস্য। আমি এঁদের কথা গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং কার্যকরি সমিতিতেও তুলেছি।"

ওপরের ঐ দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও ওঁর রাজনৈতিক মনোভাব, মতবাদ, দায় এবং দায়িত্ব, তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, সংগ্রাম সাধনা, বিদেশী শাসকরা কখনও কিছুই বোঝেনি। তারা সর্বদাই সন্দেহ করেছে যে উনি বিপ্লবী দল এবং তাদের কার্যকলাপের সমর্থক ছিলেন। উনি প্রকাশ্য ভাবে, হিজলি—বাঙালী বন্দীদের গুলি করে মারার প্রতিবাদ করেছিলেন। চট্টগ্রাম দৌরাত্ম্যে, সরকারের লোকবল আর অস্ত্রবলই শুধু নয়, বিপ্লবী দলের সংযোগও, প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করে বলেছিলেন যে জাতীয় সমস্ত সর্বনাশের মূল কারণ হল বিদেশী শাসন এবং মুক্তির অনন্য উপায় হল অহিংস নীতি অবলম্বন করে সেই শাসনের পরিসমাপ্তি। এ সব অবশ্যই বিদেশী শাসকদের অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ এবং সহজেই আন্দাজ করা যায় যে অসন্তোষের এই আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন প্রবীণ সাহেব চার্লস টেগার্ট, (কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার) যিনি, দেশপ্রিয়র লণ্ডন ভ্রমণের সময় ইণ্ডিয়া অফিসে নিয়োজিত ছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ ফল হল ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া'তে ওঁর গ্রেপ্তার। ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও ওঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল এক জেল থেকে আর এক জেলে এবং দেশপ্রিয় দেহত্যাগ করলেন তারই একটাতে।

স্মরণিকা

সুভাষচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা বিশ এবং ত্রিশের প্রথমাংশে, বলা যায়, কিছু প্রকটই ছিল, তা যে চিরস্থায়ী নয় এবং তার মধ্যেও যে আন্তরিকতার কিছু মাধুর্য ছিল তা বোঝা যায় নিচের ঘটনাবলী থেকে।

জাতীয় প্রয়োজনে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত কলকাতার অনন্য জাতীয় ভবন 'মহাজাতি সদনের' প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এর প্রথম পরিকল্পনা হয় 1937 সালে। রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় আগস্ট 1939, আর উনিই এর নামকরণ করেন 'মহাজাতি সদন'। ঠিক কুড়ি বছর পর, আগস্ট 1959, এক মহোৎসবে সদনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

এই সদনের পিছনে ছোট্ট একটা ইতিহাসও আছে। 1937 সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই অবসরে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী এবং আহ্বায়কদের ইচ্ছানুসারে এবং বিশেষ ভাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের উৎসাহে ঠিক হয় যে 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড' নামে অর্থভাণ্ডারের জন্য এক লাখ টাকা তোলা হবে। ঐ অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হয় 17ই এপ্রিল এবং সভায় চাঁদা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে যায় যে মধ্য কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য একটা হল তৈরির কাজেই টাকাটা ব্যবহার করা হবে। সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। আরও ঠিক হয় যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের দপ্তর হবে ঐ বাড়িতে এবং মিটিং ইত্যাদির জন্য বিশেষ সভাকক্ষের নাম হবে দেশপ্রিয়র নামানুযায়ী। তাঁর স্মরণিকা হিসেবে।[1]

এরপর সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই পরিকল্পনায় যোগ দেন এবং উদার চিত্তে অর্থদানের এক আবেদন জানান। হল নির্মাণের পরিপূর্ণ এবং আন্তরিক সমর্থনে 4 মে 1937, এক বিবৃতিতে জওহরলাল নেহরু বলেন :

> এই অবসরে উপযুক্ত কাজ হল, পরিকল্পিত ভবনে যে 'হল' তৈরি হবে সেটার নামকরণ হবে আমাদের পুরাতন সঙ্গী এবং বন্ধু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর নামানুযায়ী। আমি আরও আনন্দিত যে এই ভবনের পাঠাগারে থাকবে একটি হিন্দি শাখা যেখানে কংগ্রেসীরা জাতীয় ভাষা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানার্জন করতে পারবেন।

তাঁর বিবৃতিতে যতীন্দ্রমোহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পণ্ডিত নেহরু যা কিছু বলেছিলেন তা যে সুভাষচন্দ্রেরই পরামর্শে এবং সকলের সম্মিলিত মতানুযায়ী তাতে কোনই সন্দেহ নেই।[2]

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রধান 'হল' তো দূরের কথা, ভবনের কোন কক্ষই প্রস্তাব এবং প্রচারানুযায়ী দেশপ্রিয়র নামানুসারে হয়নি।

---

[1] 1977-এর 29 নভেম্বর দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত রণেন ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ।

[2] দ্য স্টেটসম্যান, কলকাতা, আগস্ট 17, 1958।

□ □